আত্মবিকাশ

আত্মবিকাশ

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয় **পৃষ্ঠা**

॥ আত্মসংযম ॥ **পৃ° ১—২৩**

মুখ্য ও গৌণ ধর্ম—ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান—মনীষী হিরাক্লিটাসের উক্তি—প্রকৃত যোগী কে—যোগশাস্ত্রের শিক্ষা কি—পশুভাবকে দমন করাই আত্মসংযম—সুসংযত জীবন—যথাযথ বিচারই আত্মসংযমের পথপ্রদর্শক—ইন্দ্রিয় ও আসক্তি—শরীরের উপর মনের প্রভাব—বাহ্যবিষয়ে সুখের অন্বেষণ—সুখ ও দুঃখদায়ক বস্তু কি—ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভোগ—মনের অবচেতন স্তর ও সংস্কার—অধ্যাপক বেনেক্ (Prof. Beneke) ও তাঁহার অভিমত—স্যার উইলিয়াম হ্যামিল্টন ও সুপ্ত সংস্কার—সংস্কারের উন্মেষ ও নূতন সংস্কার—সংস্কার ও বাসনা—ভোগতৃষ্ণার বিরাম—চঞ্চল মনের উদাহরণ—পশুপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ—ধ্যান ও ধারণা—দৃঢ়সংকল্পই আত্মসংযমের উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ধ্যান ও ধারণা ॥ **পৃ° ২৪—৪৮**

দিব্যশক্তির বিকাশ ও আধ্যাত্মিক জীবন—বিচিত্র রুচি ও সাধনপ্রণালী—রাজযোগ—যোগ অর্থে কি বুঝায়—রাজযোগী ও মানসিক শক্তি—মনের শক্তি ও মনঃসংযম—মনোযোগ কাহাকে বলে—মনোযোগশক্তি প্রকৃতির অবদান—ইতরশ্রেণীর প্রাণীদের মনোযোগশক্তি—মহাযোগী ও বক—মানসিক ও দৈহিক শক্তি—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রতিভা মনোযোগশক্তির ফল—মনোযোগশক্তি কিরূপে উন্নত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়—সমাধি—মনীষী এমার্সন ও একাগ্রতা—ইচ্ছাশক্তি ও ধারণা—বাসনা ও চিত্তবিকারের নিরোধ—ধারণা-অভ্যাসের প্রণালী—মনীষী ডিস্রেলী—পরমপুরুষার্থই আত্মজ্ঞান—যোগী ও বিক্ষিপ্ত মন—মানসিক অবস্থার পাঁচটি বিভাগ ও তাহাদের পরিচয়—ব্রহ্মানুভূতি ও নিরুদ্ধ অবস্থা—অধ্যাস—শুদ্ধচৈতন্যে ভ্রম ও তাহার উদাহরণ—ধ্যান ও ধারণার—অভ্যাস—ধারণাশক্তি ও একাগ্রতা—ডাঃ লুই (Dr. Lewes) ও মনোযোগশক্তি—খৃষ্টান সায়েন্টীষ্ট ও মানসিক শক্তি—ধ্যান ও তাহার বিষয়—নব প্রবর্তিত সাধক যোগাভ্যাস—সাধনার লক্ষ্য ও ফল।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ব্রহ্মানুভূতি ॥ পৃ° ৪৯—৮৩

মনীষী রাল্‌ফ ওয়াল্‌ডো এমার্সনের উক্তি—পরামাত্মা, জীবাত্মা ও জ্ঞান—মহামানব কাহারা—ব্রহ্মজ্ঞানী দিব্যস্বভাব—সাধারণ মানুষ আত্মপ্রতারিত হয়—প্রকৃতির সহিত মানবের সংগ্রামই জীবন—জড়প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ—আত্মপ্রকৃতির বিশ্লেষণ—আধ্যাত্মিক সংগ্রাম কখন আরম্ভ হয়—নীতিপরায়ণ ব্যক্তির স্বভাব—সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি—ত্রিগুণাতীত অবস্থা ও গৌতম বুদ্ধ—সমাধি বা দিব্যজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ—'অহং'-অভিমান—জীবাত্মার তিনটি অবস্থা—সাধক ও সিদ্ধি—অসত্যের দ্বারা সত্যলাভ হয় না—চিত্তশুদ্ধি—নিঃস্বার্থপ্রেম ও নিষ্কাম কর্ম—সাধনচতুষ্টয় ও অভ্যাস—অন্তঃপ্রকৃতির ক্রমিক বিকাশ—পরমসত্য জানিবার ক্রমিক সাধন—'এগিয়ে যাও' এবং কাটুরিয়ার উপাখ্যান—অলৌকিক শক্তিলাভ ও সিদ্ধি এক নয়—দিব্যচক্ষু লাভ ও চরমতত্ত্বের আভাস সমাধির স্বরূপ—শূন্যতা ও ব্রহ্ম—লোকনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ ও সমাধি—অনুভূতি ও ব্যুত্থান—প্লটীনাস ও ফ্ল্যার্কাস্—অতীন্দ্রিয় ভূমি ও মন—পরফাইরিয়াস্ ও ডাইওসিনিয়াস—মরমী দার্শনিক একহার্ট—মন ও বৃত্তিশূন্যতা—সমাধি ও মূর্চ্ছা এক বস্তু নয়—আত্মজ্ঞানী পুরুষের অবস্থা—ব্রহ্মদর্শনের বিচিত্র পথ—ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম—বেদান্তের বাণী—প্রকৃত ধর্ম কাহাকে বলে—নিজস্বরূপের উপলব্ধি।

॥ উপসংহার ॥ পৃ° ৮৪—৮৭

অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া।

—ধম্মপদ, অত্তবগ গো ৪ শ্লোক

আত্মাই আত্মার আশ্রয়, আত্মাই আত্মার একমাত্র প্রভু, ইহার আর অন্য কোন প্রভু নাই।

অত্তা হবে জিতং সেয্যো যা চায়ং ইতরা পজা।
অত্তদন্তস্স পোসস্স নিচ্চং সংযতচারিনো॥
নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহ ব্রহ্মুনা।
জিতং অপজিতং করিয়া তথারুপস্স জন্তুনো॥

—ধম্মপদ, সহস্স বগ্গো। ৫-৬

আত্মজয়ী মহাপুরুষ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্বদা সংযতচিত্ত! এই প্রকার আত্মবিজয়ী পুরুষের বিজয়গৌরব দেবতা গন্ধর্ব অথবা ব্রহ্মাসহ মার ইহার কেহই নষ্ট করিতে পারে না।

॥ ভূমিকা ॥

বাসনাই সংসারের মূল, বাসনা হইতে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করিলেন 'বিশ্ব সৃষ্টি হউক' তখনই তাঁহার পবিত্র ইচ্ছার ইঙ্গিতে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির প্রতিমূর্তি কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ সেই দিব্যইচ্ছার মূর্তপ্রতীক। মানুষের মধ্যেও ইচ্ছাশক্তি নিহিত এবং সেই ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ হইলে সংসারসৃষ্টি হয় এবং তাহা কেন্দ্রীভূত, শান্ত সমাহিত হইলে সংসারের লয় হইয়া থাকে। আত্মসত্তার পূর্ণ-অভিব্যক্তির নাম 'আত্মবিকাশ'। বিকাশের কারণ বাসনা ও বাসনার কারণ মন। মনের অপর নাম অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণকেই মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের স্বরূপ বলে। চিত্তের মুকুরে অনুসন্ধান করিয়া মানুষ যাবতীয় বস্তুকে জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, মনের দ্বারা সংকল্প ও বিকল্প সৃষ্টি করিয়া মানুষ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করে, বুদ্ধির দ্বারা তাহা নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বস্তুর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এবং অহঙ্কারে আপনার সসীম আয়ত্তে সকল বস্তুকে সীমাবদ্ধ করে। আসলে অন্তঃকরণই সৃষ্টির মূল ও আধার। অন্তঃকরণ বা মন যে বিশ্বসৃষ্টির কারণ তাহা যোগবাশিষ্ঠকারও উল্লেখ করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য-উপনিষদের কারিকায় আচার্য গৌড়পাদেরও ইঙ্গিত তাই। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন প্রভৃতিও মনের সংকল্পকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। সকল দর্শন ও ধর্মগ্রন্থে প্রবৃত্তিকে সংসারের সৃষ্টিবীজ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। মনের বৃত্তিচাঞ্চল্যই বিনববৈচিত্র্য ;

মন শান্ত হইলে আত্মরূপে অবস্থিতি ও শান্তি লাভ হয়। মনকে কি করিয়া জয় করা যায়, মনকে বহির্মুখী ও বৈচিত্র্যগামী না করিয়া কিভাবে আত্মবিকাশে নিয়োজিত বা কেন্দ্রীভূত করা যায়, সেই সাধনার উপায় ও ইঙ্গিত নির্দেশ করিবার জন্যই ক্রমিক সাধনরহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ও যোগীর দৃষ্টিভঙ্গীতে এই 'আত্মবিকাশ'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

'আত্মবিকাশ' *Spiritual Unfoldment* এই ইংরাজী-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূল ইংরাজী গ্রন্থের ভাষা যেমন সহজ-সরল ও প্রসন্নগম্ভীর, তাহার প্রকাশভঙ্গীও তেমনি সাবলীল। একদিকে সুতীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য ও অপর দিকে অনুভূতিলব্ধ প্রজ্ঞার আলোকে সহজ স্বচ্ছন্দ সরসতা এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা সত্যান্বেষী সাধককে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করে। 'আত্মসংযম', 'ধ্যান ও ধারণা' ও 'ব্রহ্মানুভূতি' এই তিনটি আলোচনায় স্বামীজী প্রতিপাদন করিয়াছেন মুখ্য ও গৌণ-ধর্ম, ধর্মের আসল উদ্দেশ্য আত্মসংযম লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং ধ্যান ও ধারণার দ্বারা বিক্ষিপ্ত মনকে অন্তর্মুখী করিয়া আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ করা মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাই সংকীর্ণ বা 'কাঁচা-আমি'-রূপ অজ্ঞানতাকে বিচার করিয়া দূর করিতে হয় এবং ইহাই নিঃস্বার্থ প্রেম ও চিত্তশুদ্ধির উপায়। মনের বৃত্তিশূন্যতাই মন-নিরোধ বা সমাধির স্বরূপ। এই সকল রহস্য ব্রহ্মবিদ্‌বরেণ্য স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঈশ্বর বা আত্মাকে জানিবার উপায় বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। সাধনার ক্রমিক উন্নতির পথে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি এবং বিভূতির মোহে পাছে সাধক উদ্দেশ্যহীন হন সেইজন্য সন্তর্পণে মনের বিচিত্র স্তরগুলির পরিচয় ও বিকাশের কথা বলিয়া স্বামীজী মহারাজ পরমসত্যের দিকে সাধকের মন আকৃষ্ট ও পরিচালিত করিয়াছেন।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য আত্মসাক্ষাৎকার করা। যথার্থ যোগী

কখনও যোগজ বিভূতি ও তুচ্ছ সাংসারিক বিষয়রূপ ভোগবিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করেন না। মানুষের ভাল ও মন্দের জন্য কৃতকর্মই একমাত্র দায়ী এবং কৃতকর্মের সকল সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া মনের অবচেতন-স্তরে বীজাকারে সুপ্ত থাকে। কার্য-কারণসূত্রে ঐ সংস্কার কখনও কার্য, আবার কখনও কারণরূপে প্রতিভাত হয়। জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীকৃত সুপ্ত সংস্কাররাশিই ভাগ্যনিয়ন্তা-রূপে মানুষকে সংস্কারকর্মক্ষেত্রে পরিচালিত করে। সংস্কাররাশিই কিন্তু অজ্ঞান, প্রকৃতি বা মায়া। সৎকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য সৎ-সংস্কার ভোগপ্রবৃত্তির দিক হইতে মানুষকে ফিরাইয়া আনিয়া চিরনিবৃত্তিরূপ আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়োজিত করে। Conquer habit by counter-habit—এই সাধননীতিকে অনুসরণ করিয়া মানুষ ইচ্ছা করিলে সংসার-বন্ধন হইতে এ-জন্মেই মুক্ত হইতে পারে। একনিষ্ঠ সাধনাই মুক্তির পথনির্দেশক। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন মানুষ বিচারজ্ঞানের শরণাপন্ন হইলে অন্তঃপ্রকৃতির সকল রহস্যের সমাধান করিতে পারে, তখন অতীন্দ্রিয় জগতের কোন কথা আর জানিতে তাহার বাকি থাকে না। সত্যদ্রষ্টা লোকোত্তর মহামানবদের সাধনার জ্বলন্ত আদর্শ অনুসরণ করিলে মানুষ তাহার মনের সকল রহস্য ভেদ করিতে পারে। পূর্বে বলিয়াছি, সাংসারিক বাসনায় আসক্ত মনই মানুষের বন্ধনের কারণ, কিন্তু বিষয়-মোহমুক্ত বিশুদ্ধ ও বিচারসম্পন্ন বুদ্ধিই আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্যের সমাধান করিতে পারে।

অসত্যের দ্বারা সত্য লাভ হয় না; সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যেই আত্মসাক্ষাৎকার হয়। দৃঢ়সঙ্কল্প, সাধনায় একান্ত নিষ্ঠা, ঈশ্বরানুরাগ, ব্যাকুলতা ও সর্বোপরি আত্মজ্ঞানের অনুকূল বিচার, অবিরাম যত্ন, অভ্যাস ও চিন্তা দ্বারা অধ্যাত্মচেতনার পথ উন্মুক্ত হয়, তাহাতেই ভ্রমের মরিচীকা দূর হয় এবং ব্রহ্মানুভূতির অমৃতধারায়

পরিপ্লুত হইয়া মানুষ জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার অপূর্ব মনীষাদ্বারা অধ্যাত্মজীবনে উন্নতিকামী সাধকগণকে এই গ্রন্থে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার ইঙ্গিত অতীব সুস্পষ্ট। শাশ্বত সত্যলাভের দুরধিগম্য রহস্যভেদ করিবার সুনিশ্চিত নির্দেশ, অমোঘ সাধনা ও অনুভূতির প্রতিটি স্তর অতিক্রম করিয়া সাধক কিরূপে নির্বিঘ্নে দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহারই সুসংযত ও ক্রমিক সাধনার আভাস তিনি এই গ্রন্থে দিয়াছেন।

বর্তমান পঞ্চম সংস্করণে অনুবাদ অনেকাংশে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করা হইয়াছে। একটি উপসংহার ও বিস্তৃত সূচীপত্র এই সংস্করণে সংযোজিত হইল।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

প্রথম অধ্যায়

॥ আত্মসংযম ॥

প্রত্যেক ধর্ম মুখ্য ও গৌণ দুইভাগে বিভক্ত। সাম্প্রদায়িক মতবাদ ও বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতি প্রত্যেক সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মের গৌণ অথবা অসার অংশ। তাই বলিয়া এই সকল যে অনাবশ্যক একথা বুঝায় না, বরং ধর্মসাধনার ক্রমিক উন্নতির জন্য প্রাথমিক কোন কোন অবস্থায় ধর্মবিশ্বাসীদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। আমার বক্তব্য এই শুধু এই অসার অংশগুলিই যে মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এইরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বা শাস্ত্রবিধানের অনুযায়ী এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি না মানিয়াও যে কোন পুরুষ বা নারী উচ্চতর আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করিতে পারে। সাম্প্রদায়িক মতবাদ, আচার, বিশ্বাস, পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদি না মানিয়াও মানুষের পক্ষে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া অসম্ভব নয়। যাঁহারা মনে করেন যথার্থ ধর্মলাভের জন্য এই সমস্ত অসার অংশগুলি অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় তাঁহারা

ধর্মসাধনার প্রকৃত মর্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভ্রমবশত ধর্মের অসার অংশগুলিকে সারবস্তু বলিয়া মনে করেন। এই সকল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অনুভূতিসঞ্জাত অন্তর্দৃষ্টি নাই। কিন্তু যাঁহারা ধর্মের প্রকৃত স্বরূপের সহিত পরিচিত তাঁহারা এই সব অসার ও অবান্তর আচার-অনুষ্ঠানে সময় ও সামর্থ্যের অপব্যয় না করিয়া নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের মূলনীতিকে প্রতিপালন করিতে সচেষ্ট হন। যথাসম্ভব অল্পকালের মধ্যে এই শ্রেণীর ঐকান্তিক ও সরলচিত্ত সাধকেরা ধর্মসাধনার গন্তব্যস্থলে উপনীত হইতে সমর্থ হন।

আত্মসংযম এবং আত্মজ্ঞানই ধর্মের প্রকৃত অথবা মুখ্য অংশ। নিজের প্রকৃত স্বরূপ অথবা দিব্যপ্রকৃতি উপলব্ধি করার ফলে যে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় তাহাই আত্মজ্ঞান আর স্বার্থান্ধতা ও পশুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ জয় করাকে আত্মসংযম বলে।) মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। প্রাচীন যুগে গ্রীক দার্শনিকগণ আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানকে ধর্মের সারবস্তু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য ডেল্‌ফির (Delphi) বিখ্যাত মন্দিরের তোরণশীর্ষে 'আপনাকে জানো' ('আত্মানং বৈ বিজানথ') অথবা Know thyself এই মহাবাণী স্পষ্টাক্ষরে প্রস্তর ফলকে খোদিত করা হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক মনীষী হিরাক্লিটাস (Heraclitus) এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন: "এই উক্তি (Know thyself) সমস্ত ব্যক্তিকে তাহাদের

দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মসংযম অভ্যাস করিতে অনুপ্রাণিত করে"।[১]

প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা আর্যঋষিগণ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ এমন নিখুঁৎভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের নামে প্রচলিত অবান্তর ও অযৌক্তিক সমস্ত ব্যাপার হইতে ধর্মের এই বিশুদ্ধ ভাবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সর্বপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঋষিদের এই প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে যোগসাধনার বিচিত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ধর্মের সারবস্তুকে জীবনে পরিণত করা অথবা তাহার সম্বন্ধে বিচার ও বিশ্লেষণে মানুষকে প্রবৃত্ত করাই যোগশাস্ত্রের কার্য। যিনি আত্মজয়ী অর্থাৎ সর্বতোভাবে সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি ও পশুভাবকে জয় করিয়া আত্মজ্ঞানসম্পন্ন তিনিই প্রকৃত যোগী। আত্মসংযম কি? কি প্রকারে ইহা লাভ করা যায়? আত্মজ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ কি?—এই সকল বিষয়ের সমাধান করাই যোগশাস্ত্রের বিশেষত্ব। সেইজন্য যোগসাধনায় অধিকারী সাধকেরা ধর্মের অসার ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া অযথা শক্তিক্ষয় করিতে চাহেন না। তাঁহারা যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিহিত সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এবং ধর্মের চরমগন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়া আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ করেন।

১। হিরাক্লিটাস গ্রীসের অন্তর্গত এফিসাস (Ephesus) নগরে ৫৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঐ নগরীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধর্মের গৌণ বিষয়গুলি যেন একটি প্রকাণ্ড তুষের স্তূপ এবং সত্যের সারাংশ বা তত্ত্ব ফলের শাঁসের ন্যায় তাহার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। যেখানে এই গৌণভাবের আধিক্য সেখানেই ধর্মের কলুষতা, কুসংস্কার ও কৃত্রিম ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং সেখানেই ক্রিয়াকাণ্ড, অনর্থ আচার প্রভৃতি গৌণভাগগুলি ধর্মজীবনের জন্য অবশ্য পালনীয়—এই ভ্রান্তি দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণকে অভিভূত করিয়া থাকে। কিন্তু যোগশাস্ত্র সর্ববিধ গোঁড়ামীপূর্ণ মত ও ক্রিয়াকাণ্ড হইতে মুক্ত বলিয়া কোনরূপ কলুষতা অথবা কুসংস্কার উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেইজন্য উহা কোন বিশিষ্ট ধর্মমতেরও মুখাপেক্ষী হয় না, কারণ উহা বিশুদ্ধ ও সরল। অধ্যাত্মজীবন, উচ্চতত্ত্বান্বেষী ঐকান্তিক এবং অকপট ব্যক্তিগণই যোগশাস্ত্রের উপদেশকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সেইজন্য ধর্মের সারতত্ত্বগুলিকে উচ্চতম আদর্শরূপে তাঁহারা বরণ করিয়া আপনাদিগকে ধর্মভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং কি উপায়ে তাঁহারা আত্মসংযম ও পরমাত্মাসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন যোগশাস্ত্র তাহাই শিক্ষা দান করে।

জীবাত্মার মধ্যে সুপ্তভাবে অবস্থিত উন্নত শক্তিসমূহের বিকাশ দ্বারা নীচ প্রকৃতি অথবা পশুভাবকে দমন করাকে 'আত্ম-সংযম' বলে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী হইতে ক্রমবিকাশের উত্তরোত্তর স্তরগুলিকে একে একে অতিক্রম করিয়া মানুষ প্রথমে জৈব বা পশুস্তরে অবস্থান করে। পরে সে যেরূপে উচ্চ হইতে

উচ্চতর অবস্থা লাভ করিতে থাকে সেরূপে তাহার প্রসুপ্ত শক্তিসমূহ ক্রমশ বিকশিত হয় এবং পশুপ্রবৃত্তিগুলিকে সে সংযত ও প্রশমিত করিতে পারে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হইয়া স্বীয় বৃত্তিরূপ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য প্রভৃতি রিপুদের সেবায় অন্ধভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে তাহার চরিত্রে কখনও আত্মসংযমের বিকাশ হয় না। যাঁহারা আপনাদিগকে সংযত রাখিতে ও মনের বিষয়াভিমুখী উদ্দাম গতিকে দমন করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধনপথের অন্তরায় বা শত্রুরূপ পশুবৃত্তি গুলি হইতে বিরত হইয়াছেন তাঁহারাই মুক্তি লাভ করিয়া আজীবন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি উপভোগ করেন। (কিন্তু যাহারা অবিরত কাম ক্রোধ ঈর্ষা ও ঘৃণাদির আক্রমণে অভিভূত তাহাদের মন অস্থির ও চঞ্চল এবং তাহারা সর্বদাই অশান্ত ও অসুখী।) যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস তাহারা কিরূপে সুখের আশা করিতে পারে। মুক্তির অবস্থাই সুখ, দাসত্বে সুখ নাই আর সেই মুক্তি বা স্বাধীনতা একমাত্র আত্মসংসম অভ্যাসের দ্বারাই লাভ করা যায়। অতএব যাঁহারা ইহজগতে অপার আনন্দ ও শান্তিলাভের অভিলাষী তাঁহাদিগকে আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া আত্মস্বাধীনতা বা মুক্তি লাভের জন্য যত্নবান হইতে হইবে।

নিজের মনকে যাঁহারা পরীক্ষা করিতে শিখিয়াছেন এবং নিজের দুর্বলতা জানিতে পারিয়া চরিত্র সংশোধনে সচেষ্ট

হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেই আত্মসংযম লাভ অতি সহজ। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ন্যায় কেবল তুচ্ছ ঐহিক সুখের অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহার করাই মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যতদিন মানুষ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে, যতদিন সে নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে অক্ষম, যতদিন সে সুখ ও আনন্দ বাহ্যবস্তু অথবা অন্তর হইতেই উৎপন্ন হয় ইহা বুঝিতে অসমর্থ হয়, ততদিন সে নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে না[১]। প্রকৃতপক্ষে সুখ ও দুঃখ কিরূপ অবস্থার উপর নির্ভর করে তাহার যথার্থ বিচারই আত্মসংযমলাভের উপায়।

এক্ষণে আমাদের মনের বর্তমান অবস্থা কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। মানুষের মন স্বভাবত ইন্দ্রিয়সুখকর পদার্থ অথবা অন্তরের তীব্র বাসনা ও ভোগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক বস্তুসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অধিকাংশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ও মনের সুখদায়ক বিষয়ে আসক্ত এবং তৃপ্তি না পাইলে তাহারা কোন বিষয় বা ব্যক্তির প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এরূপে ইহা হইতে বুঝা যায় দুঃখ ও মানসিক ক্লেশ হইতে দূরে থাকাই মানবমনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। চক্ষু প্রীতিকর বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার দর্শনে আনন্দ পায়, কর্ণ সুমিষ্ট বাক্য সুমধুর স্বর ও সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করে। আমরা সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ লইতে ও রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য আস্বাদন

১। শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগ স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

—গীতা ৫।২৩

করিতে ভালবাসি। কিন্তু একই বস্তু আবার একজনের পক্ষে যেমন ইন্দ্রিয়সুখকর অন্যের পক্ষে তেমনি কষ্টদায়ক হইতে পারে। চীনদেশবাসীদের পক্ষে চীনদেশীয় সঙ্গীত পরম-উপভোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবাসী আমাদের কর্ণে তাহা কষ্টদায়ক। আবার আমাদের কর্ণে যে সঙ্গীত আনন্দদায়ক চীনবাসীরা তাহাতে কোনরূপ তৃপ্তিলাভ করে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণের নিকট পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর বিকট চিৎকার বলিয়া মনে হয়। অনেকে খাদ্যে উগ্র গন্ধ ও নানাপ্রকার মশলাদি ব্যবহার করিতে ভালবাসে, কিন্তু অনেকে উহাতে বিরক্ত হয়। জিহ্বায় ও কণ্ঠনলীতে লঙ্কার তীব্র আস্বাদ কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত রুচিকর, কিন্তু অপরের নিকট তাহা আবার কষ্টদায়ক বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। একই বর্ণ, শব্দ বা আস্বাদ—একজনের নিকট তৃপ্তিকর হইলেও অপরের নিকট আবার বিষম যন্ত্রণা-দায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হয় সুখ ও দুঃখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত কোন গুণবিশেষ নহে, বরং ঐ বস্তুর সহিত শরীর ও মনের যে সাক্ষাৎসংযোগ হয় তাহাদের অবস্থার উপর সুখ ও দুঃখের অনুভব নির্ভর করে। শরীরের উপর মনের প্রভাব বিশেষ প্রবল। কোনও একটি ভাব মনকে অধিকার করিলে শরীরের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং সমগ্র দেহ সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। যে মন এক সময়ে কোন বস্তুবিশেষে অত্যন্ত আনন্দ

পাইত সেই মনই আবার কোন নূতনভাবে ভাবিত হইলে পূর্বেকার প্রিয় বস্তুর দৃষ্টি পর্যন্ত আর সহ্য করিতে পারে না। মাংসাশী ব্যক্তি যতদিন মনে করে মাংসই তাহার উপযুক্ত খাদ্য ততদিন মাংসভোজন তাহাকে তৃপ্তিদান করে, কিন্তু নিরামিষ আহারের উপযোগীতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যখন সে আবার নিরামিষাশী হয় তখন মাংসের গন্ধ পর্যন্ত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে এবং উহাতে বরং সে অশ্বস্তি বোধ করে। তাহার পাকস্থলী আর তখন মাংস পরিপাক করি চাহে না, মাংস আহার করিলে বরং সে যন্ত্রণা অনুভব করিয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা হইতে সকল ব্যক্তি অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখ লাভ করিতে পারে, অথবা যাহা একই ব্যক্তিকে সকল সময়ে সুখ বা দুঃখ দান করে। যাহারা বাহ্যবস্তু হইতে সুখ অন্বেষণ করে তাহারা সকল সময়ে কোন-না-কোন একটি দ্রব্যের ভোগে আসক্ত থাকিতে পারে না। প্রত্যহ একটি বস্তু উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলে শীঘ্রই তাহাতে তাহাদের অরুচি জন্মিয়া থাকে, কেননা (ভোগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইল ভোগ-বিতৃষ্ণা।) সেই সঙ্গে উদাসীনতাও আসিয়া উপস্থিত হয়।

মনে করুন গীতিনাট্যে অত্যন্ত অনুরক্তা কোন মহিলা অন্য কিছু কাজ না করিয়া শুধু যদি দিবারাত্র একই গীতিনাট্য ক্রমাগত শ্রবণ করিতে থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতি অল্প দিনের মধ্যে উহার প্রতি তাঁহার বিরক্তি দেখা দিবে। সেইজন্য

যাহারা কেবল বহির্জগতেই সুখ অন্বেষণ করে তাহাদের পক্ষে ভোগ্যবস্তুর অবিরত পরিবর্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই দারিদ্র্যবশত নানাবিধ ভোগ্যবস্তুসংগ্রহে অক্ষম অনেক ব্যক্তি অর্থরাশিকে নিজেদের বাসনাপূরণের একমাত্র উপায় ভাবিয়া আত্ম প্রতারণা করে এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণই সুখী এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। সেইজন্য যে সকল আনন্দ তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে তাহাও তাহারা উপভোগ করিতে পারে না এবং এইরূপে জীবনকে তাহারা দুর্বিসহ করিয়া তুলে। বিষয়-ঐশ্বর্য কিরূপে দুঃখ ও দুশ্চিন্তা উৎপাদন করে এবং তাহা দারিদ্র্য অথবা দুঃখ অপেক্ষা যে বড় কম দুঃসহ নহে ইহা ঐ ব্যক্তিরা বুঝিতে পারে না। আসলে যিনি মনকে সংযত করিতে সক্ষম একমাত্র তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইয়া আনন্দে থাকেন। সেইজন্য অসুখী ব্যক্তিগণের পক্ষে আত্মসংযমের অভ্যাস মহাকল্যাণকর এবং উহাতে তাহাদের জীবন স্বচ্ছন্দ ও সুখকর হয়।

বাহ্যবিষয়ে সুখের অন্বেষণে মনের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাহা দমন করিবার পূর্বে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, সুখানুভব দুঃখবোধের উপরই নির্ভর করে। যদি আমাদের কোনরূপ দুঃখবোধ না থাকে তাহা হইলে আমরা কোন সুখকর অবস্থাও উপভোগ করিতে পারি না, কেননা দুঃখের সহিত তুলনা করিলেই কেবল সুখকে সুখ বলিয়া অনুভব

করা যায়। যেমন যখন আমরা একটি অনুভবের অবস্থা বা মনোভাবকে অপর একটি মনোভাবের সহিত তুলনা করি তখনই তাহাদের একটি যে অন্যটি অপেক্ষা অধিকতর সুখদায়ক তাহা বুঝিতে পারি এবং সেজন্য যেটি অপেক্ষাকৃত অল্প তৃপ্তিকর সেটিকে সাধারণত আমরা দুঃখদায়ক বলিয়া অভিহিত করি। বর্তমানে আমরা যে সকল বস্তু উপভোগ করিতেছি তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর সুখদায়ক বস্তুর অন্বেষণ করাই আমাদের মনের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং সেজন্য অধিকতর আনন্দ দিতে পারে এরূপ কোন বস্তুর সন্ধান পাইলে তাহাকে লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রবল বাসনা উদ্ভূত হয়। পুনরায় সেই বাসনা চরিতার্থ হইলে যদি তুলনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, পরবর্তী ভোগের অবস্থা পূর্ববর্তী ভোগের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর সুখদায়ক নয় তাহা হইলে আমরা পূর্বের ন্যায় আবার অতৃপ্ত থাকি, এমন কি পূর্বাবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবারও ইচ্ছা করি। অতএব ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, একই বিষয়ের সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সুখ দুঃখ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হইলেও সুখান্বেষণ ও দুঃখকে পরিহার করাই মনের স্বাভাবিক গতি বা প্রবৃত্তি। যাহার সংস্পর্শে আমাদের সুখলাভ হয় সেই বিষয়ে আমরা আসক্ত হইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যে মুহূর্তে আবার আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলি আমাদিগকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না সেই মুহূর্তে আমরা তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ি।

কখন কখনও তাহাদের প্রতি আমাদের ঘৃণার উদ্রেক হয় ও তাহাদের সংস্রব হইতে দূরে পলায়ন করিতে ইচ্ছা হয়।

আমাদের মন সর্বদা ইন্দ্রিয়পথ দিয়া নূতন নূতন উপভোগের বস্তু অন্বেষণ করে এবং কোন নূতন বস্তু হইতে সুখকর অনুভূতির উদ্রেক হইবে বলিয়া জানিতে পারিলে তাহাতে আসক্ত হয়। যতদিন এই আসক্তি থাকে ততদিন মনও আসক্তির দাসরূপে থাকে। ঘটনাবশত যদি কোন প্রতিবন্ধক মনকে ভোগের বিষয়লাভে বাধা দান করে তাহা হইলে মন আবার সেই বাধা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। সেই বাধার শক্তি যত প্রবল হয়, মনের প্রতিহত করিবার চেষ্টাও ততো দৃঢ় হয়। পুনরায় বাসনা অত্যন্ত প্রবল হইলে এবং সাধারণ উপায়ে তাহা চরিতার্থ করিতে না পারিলে আমরা প্রায়ই ক্রোধান্ধ হইয়া কোন অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করি এবং সেই সঙ্গে মানসিক শান্তিলাভের সকল সম্ভাবনাকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। সামান্য সামান্য ভোগবাসনা ক্রমে প্রবল কামনায় পরিণত হইয়া সমস্ত মনটীকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। ক্রমে তাহা ক্রোধ ও চাঞ্চল্যে পরিণত হয় এবং মনের সেই বিচলিত অবস্থায় যখন আমরা সদসদ্বিচারশূন্য হই তখনই আমাদের স্মৃতিবিভ্রম ও বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তখন অপরিণামদর্শী হইয়া আমরা পশুর ন্যায় ব্যবহার করি। বাসনার প্রবলতর ভাবই 'কাম' আর সেই প্রবল বাসনাই বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধের আকার ধারণ করে। প্রথম অবস্থায় 'বাসনা', দ্বিতীয় অবস্থায়

'কাম' ও তৃতীয় অবস্থায় 'ক্রোধ'-এর উৎপত্তি হয়।[১] কাম ও ক্রোধ হইতে আবার ঘৃণা ঈর্ষা প্রভৃতি নানাপ্রকার অকল্যাণকর ভাবের সৃষ্টি হয়। জগতের ভীষণ যত পাপকার্য এই সকল কুভাবেরই বহির্বিকাশ মাত্র। যিনি মনকে কাম ও ক্রোধ দ্বারা বিচলিত হইতে না দিয়া সংযত রাখিতে পারেন তিনিই প্রকৃত আত্মসংযম লাভ করেন। মন যখন আর বাহ্যবিষয়ে সুখ অন্বেষণ করে না, যখনই উহা পূর্বের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে যে ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষণস্থায়ী এবং সেই সুখ প্রকৃতপক্ষে জাগতিক বিষয়ে নিহিত নহে, বরং তাহা ভোক্তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপরই অধিকাংশ স্থলে নির্ভর করে তখনই সেই মন কাম ও ক্রোধকে দমন করিতে পারে।

পূর্বে বলিয়াছি কাম ও ক্রোধ বাসনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা। যোগীদিগের মতে এই বাসনাসমূহ সকলের মনে সুপ্ত বা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে এই বাসনাগুলি কেন হয়? যোগীগণ ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন আমাদের মনের সুপ্ত সংস্কাররাশি হইতে বাসনার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ সংস্কার-গুলির জাগ্রত অবস্থাই 'বাসনা'।' যোগীরা আরও বলেন বহির্জগতের কোন বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারা উপভোগ করার

১। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম ঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রনশ্যতি॥

—গীতা ২।৬২-৬৩

সময় সেই বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংযোগের ফলে আমাদের মনে কতকগুলি পরিবর্তনের ছাপ পড়ে। একটি আপেল খাইলে তাহার স্বাদের একটি ছাপ বা সংস্কার এবং কোন সঙ্গীত শ্রবণ করিলে তাহার একটি তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর অনুভূতি আমাদের মনে থাকিয়া যায়। এইরূপে বর্হিবিষয়ের যে সকল সংস্কার মনের উপরে অঙ্কিত হয় সেই সমস্ত সংস্কার মনে বীজাকারে সুপ্তভাবে অবস্থান করে, কারণ কোন শক্তি কখনও বিলুপ্ত বা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। সুতরাং সংস্কারগুলির কোনটিরই নাশ হয় না।

আমরা জীবনে যে সকল সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়াছি তাহা মনের অবচেতন স্তরে বীজাকারে বা সুপ্ত সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে। সুপ্ত সংস্কারগুলিই বাসনার কারণ। পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন বৈজ্ঞানিকও যোগীদের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক বেনেক্ (Prof. Benke) তাঁহার *Elementary Psychology* (প্রাথমিক মনস্তত্ত্ব) নামক পুস্তকে বলিয়াছেন: "মনে একবার যাহা সৃষ্টি হয় বাহিরে তাহার উদ্দীপনা বন্ধ হইলেও সূক্ষ্মরূপে তাহার সত্তা থাকিয়া যায়। যাহা সচেতন বা ব্যক্ত ছিল তাহা কেবল অবচেতন বা অব্যক্ত রূপে বা অন্তঃপ্রকৃতিতে লীন থাকে"। সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনও মনের এই সুপ্ত সংস্কারের সত্তা স্বীকার করেন। তিনি বলেন: "ব্যক্ত অবস্থায় যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানগোচর হয় সেগুলি

অব্যক্ত অবস্থা হইতে সৃষ্ট"। তিনি শ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি বিলিয়ার্ডবলের সহিত ঐ সকল সংস্কার অথবা চিন্তাপরম্পরার তুলনা করিয়া মনের অবচেতন স্তরে (subconscious) মানাসিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐরূপ শ্রেণীবদ্ধ বলগুলির এক প্রান্তে প্রথম বলটিতে আঘাত করিলে অপর প্রান্তে শেষ বলটিই কেবল গতিশীল হয় ও সেই স্পন্দনটি অন্য বলগুলির ভিতর দিয়া আবার সঞ্চারিত হয়। কিন্তু যোগীগণ বলেন এই সুপ্ত সংস্কারগুলিই সকল বাসনার বীজ বা যথার্থ কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে আমাদের চিত্ত যেন একটি সমুদ্র, অনুভূতিস্তর তাহার উপরিভাগ এবং সুপ্ত সংস্কারগুলি তাহার উপরিভাগ হইতে বহুনিম্নে বা তলদেশে নিহিত। এক্ষণে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যাহা কিছু অব্যক্তভাবে থাকে অনুকূল অবস্থার সমাবেশ হইলে তাহা বাহিরে ব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়। সুপ্ত সংস্কারগুলি যখন তাহাদের অন্তর্বর্তী স্বাভাবিক শক্তিতে বাহিরে বিকশিত হয় তখন যেন উহারা চিত্তসমুদ্রের তলদেশ হইতে অতিসূক্ষ্ম বুদ্বুদরূপে ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে বলা যায়। এই বুদ্বুদকে বাসনার সূক্ষ্ম অবস্থা বা সংস্কারের উদ্দীপনা বা উন্মেষ বলা যাইতে পারে। তাহার পর উহারা ক্রমে মনের উপরিভাগে উঠিতে থাকে ও ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর আকার ধারণ করে। এই জাগ্রত সংস্কারের বুদ্বুদ অবস্থাকে 'বাসনা' বলা হয়। পরে

১। স্বামী অভেদানন্দ : True Psychology, pp.41-44

বাসনারূপ বুদ্বুদ মনসমুদ্রের উপরিভগে কিছুকাল ক্রিয়া করিয়া পরিবর্তিত হয় ও তরঙ্গের আকার ধারণ করে এবং সমগ্র মন-সমুদ্রকে আলোড়িত করিয়া অবশেষে এক প্রবল শক্তিপুঞ্জে পরিণত হয়। তখনই আমাদের মন চঞ্চল ও বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়, আমাদের বিচারশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা সেই সকল প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে তাহাতে কি ভাল অথবা কি মন্দ ফল হইবে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমরা তখন যেন বলপূর্বক বাসনার বিষয়াভিমুখে তাড়িত হই এবং সেইগুলি দুরাকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কারাদি মানসিক অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নামে পরিচিত।

এই বাসনাতরঙ্গ আমাদের সংযমের সীমা অথবা শক্তিকে অতিক্রম করিলে আমরা আর তাহাকে 'বাসনা' বলিতে পারি না। উহা কিছুকাল প্রবল প্রবৃত্তি অথবা কামের প্রচণ্ড আকার ধারণ করে ও সেই প্রবল প্রবৃত্তি আমাদের স্নায়ু, মাংসপেশী ও সমস্ত শরীরকে অভিভূত করিয়া ফেলে। আর তখনই বাসনাটি চরিতার্থ করার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করি, কিন্তু সেই বিষয়টি পাইলেও আমাদের বাসনা পূর্ণ হইলে দেখি বাসনাজনিত তৃপ্তি বা আনন্দ অতিশয় ক্ষণিক। যে প্রবল তরঙ্গ আমাদের আত্মসংযম বিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহা তখন ক্রমশ শান্ত হয় এবং যে বাসনা আমাদের মনকে উত্তেজিত করিয়াছিল তাহা পুনরায় অব্যক্ত অবস্থায় অবচেতন স্তরে ফিরিয়া যায়। তখন ক্ষণিকের জন্য আবার আমাদের

মানসিক শান্তি ফিরিয়া আসে এবং আমরা কিছুক্ষণ মাত্র আনন্দ ও সুখ অনুভব করি। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি সুপ্ত সংস্কার বুদ্বুদাকারে প্রকাশিত হওয়ার জন্য উদ্যম হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে উহা মনের অবচেতন স্তর হইতে সচেতন স্তরে প্রকাশিত হয় এবং পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যাহারা মনকে সংযত করিতে শিক্ষা করে নাই তাহাদের দৈনন্দিন জীবন এইরূপ বাসনাসমষ্টির ঘাত-প্রতিঘাত ও সেগুলির ক্ষণিক পরিতুষ্টিকে লইয়াই গঠিত হয়। মনের এই ক্ষণস্থায়ী শান্তি বা তথাকথিত সুখলাভের পর বাসনাটি অল্পাধিক কালের জন্য সুপ্ত বা অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অবশ্য প্রতিমুহূর্তে মানুষের মনে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া অতি সুস্বাদু কোন সামগ্রী আহার করিল এবং ঐ দ্রব্য পূর্বে কখন আস্বাদন করে নাই বলিয়া সে অতিশয় তৃপ্তিলাভও করিল। এখন ভোজন শেষ হইয়া গেলে কি সেই স্বাদের অনুভূতি তাহার মন হইতে লোপ পাইবে? কখনই না। উহা সুপ্তভাবে তাহার মনেই অবস্থান করে এবং পুনরায় তাহার সেই বাসনা জাগ্রত হইয়া থাকে। স্মৃতিই ঐ পূর্বসংস্কার জাগ্রত করিয়া দিবে এবং উহা পুনরায় নূতন বাসনার কারণ হইবে। এইরূপে দেখা যায় প্রত্যেক নূতন সংস্কার আর এক নূতন বাসনার বীজ বা কারণস্বরূপ হয়।

যখন কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবন করিতে আরম্ভ করে

তখন তাহার কতকগুলি অদ্ভুত অনুভূতি হয়। উহা যেমন তাহার জড়তা দূর করে, মনে আনন্দ আনিয়া দেয়, তাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে এবং কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সুখী করে তেমনি উত্তেজক পদার্থের কার্য শেষ হইয়া গেলে তাহা হইতে উৎপন্ন সুখকর অনুভূতির ছাপ অথবা সংস্কারও তাহার মনের মধ্যে থাকিয়া যায়, কিছুকালের জন্য উহা প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত থাকে কিন্তু পরে আবার বাসনা অথবা বুদ্বুদাকারে মনঃসমুদ্রের উপরিভাগে ভাসমান ও ক্রিয়াশীল হয়। সেখানে উহা কার্যাকারে তরঙ্গ অথবা তীব্র প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে এবং ক্রমে তীব্রতর হইয়া পুনরায় তাহাকে সেই মাদক দ্রব্য সেবনে প্রবৃত্ত করে। তখন আর একটি নূতন সুখকর সংস্কার পূর্বসংস্কারের উপর আরোপিত হয় এবং পুনঃপুনঃ এই প্রণালী অনুবর্তিত হইতে থাকে। প্রত্যেকবার বাসনার বশবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সংস্কারটি দৃঢ়তর হয় এবং অবশেষে সঞ্চিত সংস্কাররাশি এত প্রবল হইয়া উঠে যে, উহা ঐ ব্যক্তির স্বভাবে অর্থাৎ অভ্যাসেই পরিণত হইয়া যায়।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভাল ও মন্দ যত প্রকার অভ্যাস দেখিতে পাই সে সমুদয় এ' ভাবেই সৃষ্টি হয়। আমরা যাহাকে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সহজ বা স্বাভাবিক জ্ঞান (instinct) বলি তাহাও ঠিক ঐ প্রকারে উৎপন্ন হয়। এক জন্মের সঞ্চিত সংস্কাররাশি শরীর বিনাশের সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায় না, তাহারা কিছুকালের জন্য অব্যক্ত

অবস্থায় থাকে এবং পরজন্মে ভাবী বাসনাসমূহের কারণ-স্বরূপ হয়। আমরা প্রত্যেকে পূর্বজন্মের সঞ্চিত সংস্কারসমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করি এবং সেগুলি নানাবিধ প্রবৃত্তি, বাসনা ও স্বভাবরূপে পরে অভিব্যক্ত হয়। একই পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিতে এত অধিক বৈষম্য হওয়ার কারণও ইহাই, তাই কেবল মাত্র বংশগত গুণানুবৃত্তি অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বংশানুক্রমিক ঐ বৈষম্যের সমাধান করিতে পারে না।

পূর্বে বলা হইয়াছে সংস্কারের সংখ্যা যত অধিক হইবে বাসনাও তত বৃদ্ধি পাইবে। যদি বাসনাকে জাগ্রত হইতে ও মনের উপর ক্রিয়া করিতে দেওয়া যায় তাহা হইলে উহা কাম ও ক্রোধের আকার ধারণ করিয়া মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে এবং পুরাতন সংস্কার আবার নূতন সংস্কার ও বাসনার সৃষ্টি করে। অতএব বাসনা চরিতার্থ করিয়া মনকে আয়ত্ত করিবার আশা করা যায় না। উপভোগ্য বস্তু-লাভের দ্বারা ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার কোনই সম্ভাবনা নাই, উহাতে কেবল অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগ বা অগ্নিশিখায় তৈল নিক্ষেপের মতো প্রবল করিয়া তোলা হয়। যত ভোগ করিবে, বাসনাও তত বৃদ্ধি পাইবে। যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি কখনও মনকে বিশ্লেষণ বা বিচার করিয়া দেখে নাই তাহারাই বাসনার বশবর্তী হয় ও বাহ্যবস্তুতে সুখের অন্বেষণ করে। বাসনার দাস হইয়া কেহ কখনও আত্মসংযম লাভে কৃতকার্য হয় নাই এবং বাসনা চরিতার্থ করিয়াও কেহ কখনও

বাসনামুক্ত হইতে পারে নাই। সেইজন্য যোগীগণ বলেন: "অগ্নি যেরূপ ঘৃতদ্বারা নির্বাপিত করা যায় না বাসনারূপ অগ্নিও সেরূপ ভোগ্যবস্তু দ্বারা প্রশমিত হয় না। অগ্নিতে যতই ঘৃতাহুতি দেওয়া যায় অগ্নিশিখা ততই আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বিষয়ের ভোগের দ্বারা সেইরূপ বাসনাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যদি কেহ পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর অধিকারী হয় তথাপি তাহার ভোগস্পৃহা মিটিবে না, বরং তাহা আরও অধিক কিছু লাভের অন্বেষণ করিবে। এখন যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে ব্যক্তি লক্ষপতি হইবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছে সে সেরূপ ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইলে কি তৃপ্ত হইবে অথবা আরও অধিকতর লাভের চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে? না, বরং যতদিন সে জীবিত থাকিবে ততদিন আরও ধনবৃদ্ধি করিতেই চেষ্টা করিবে। দরিদ্র ধনী হইতে চায়, ধনী লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা করে ও লক্ষপতির মনে কোটিপতি হইবার বাসনা হয় এবং এইরূপে বাসনা বাড়িয়া চলে। তাহা হইলে শান্তি কোথায়? সুখই বা কোথায়? আর মানবের বিষয়-বাসনার অথবা ভোগতৃষ্ণার বিরামই বা কোথায়? বাসনাসক্ত ব্যক্তি কি কখনও মনের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারিবে? সম্ভবতঃ এ জন্মে নয়। ভোগতৃষ্ণাই আমাদের জীবনে প্রকৃত ব্যাধি; আর কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ঈর্ষ্যা ও ঘৃণা

১। ন জাতু কাম কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে —নারদপরিব্রাজক উ ৩।৩৭।

প্রভৃতি ইহার উপসর্গ। চঞ্চল মন যাহাতে কাম ও ক্রোধরূপ তরঙ্গের আকার ধারণ করিতে না পারে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং তাহাকে সংযত করিতে হইলে তীব্র ইচ্ছা ও মনোবল থাকা আবশ্যক। কাম ও ক্রোধের দাসস্বরূপ সাধারণ মানবের দারুণ মানসিক চঞ্চলতাকে কোনও যোগী অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং অন্য কোন যোগ্যতর উপমা না পাইয়া তিনি উহাকে একটি স্বভাবচঞ্চল বানরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, উহা যথেষ্ট হয় নাই ভাবিয়া তিনি বানরটিকে সুরাপানে উন্মত্ত ও বৃশ্চিকদষ্ট বলিয়াছেন। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তি সারাদিন ছটফট করে, সুতরাং বানরটি এইরূপ হইলে বানর বেচারীর অস্থিরতাও কল্পনা করিয়া দেখিবার বিষয়! যোগী দেখিলেন তথাপি যেন তাঁহার উপমা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। অবশেষে বানর আবার ভূতগ্রস্ত এই বলিয়া তিনি উপমা শেষ করিয়াছেন। অতএব বানর বেচারার দুরবস্থা বর্ণনা করিবার ভাষা বাস্তবিকই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সাধারণত আমাদের মনের অবস্থা এইরূপ। মানুষের মন স্বভাবতই চঞ্চল। বিষয় বাসনারূপ সুরাপান করিয়া সে আরও চঞ্চল হইয়া ওঠে তাহার পর ঈর্ষারূপ বৃশ্চিক দংশনে সে আরও চঞ্চল হয় এবং অভিমানরূপ অসুর তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে অভিভূত করিলে সেই চঞ্চলতা আরও চরম হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অবস্থাগ্রস্থ মনকে বশীভূত করা কত কঠিন। এজন্য সমগ্র জগৎ

জয় করা অপেক্ষা মনকে জয় করা আরও কঠিন। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ বীর ও প্রকৃত বিশ্ব-বিজয়ী। কথিত আছে: "যিনি আত্মজয় করেন তিনি রাজ্যবিজয়ী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা"।[১]

যোগীরা বলেন: "যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে জয় করেন আর অন্য কেহ যদি কেবলমাত্র আপনাকে জয় করেন তবে শেষোক্ত ব্যক্তি বিজয়ীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"।[২] অতএব মনঃসংযম অনুশীলন করিবার জন্য আমাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত এবং মানস প্রকৃতির বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা উহার বিচিত্র পরিবর্তন স্থিরভাবে লক্ষ্য করিয়া আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় ও বর্ধিত করিবার প্রণালী শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। যোগীপুরুষ প্রতিদিন অভ্যাসের দ্বারা স্বীয় ইচ্ছাশক্তিকে ক্রমশ বর্ধিত এবং উচ্চতর শক্তি-সমূহকে জাগ্রত করিয়া যতক্ষণ না সিদ্ধিলাভ হয় ততক্ষণ দুর্ধর্ষ রিপুগণের সহিত দৃঢ় সঙ্কল্পসহকারে অবিরত সংগ্রাম করেন। মনের যে অবস্থায় কোন প্রকার কাম অথবা বাসনা উদিত হইয়া চিত্তের শান্তি কিম্বা প্রশান্ত ভাব নষ্ট না করে তাহাকে যোগীগণ পরিপূর্ণ আত্মসংযম বলেন। বাসনাসমুদ্রের জলবিন্দুগুলি কাম-রিপুর আকার ধারণ করিবার পূর্বেই

১। রাজা করে রাজবশ যোধ করে রণ জই!
আপ মনকো বশ করতা সবসে সেরা ওই ॥—তুলসীদাস

২। যো চ সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে
একঞ্চ জেয্যমত্তানং স বে সংগ্রামজুত্তমো ॥ —ধম্মপদ ৮।৪

তাহাদিগকে দূরীভূত করিলে, অর্থাৎ ক্ষীণ বা দুর্বল অবস্থাতে উহাদিগকে প্রতিরোধ করিলে অপেক্ষাকৃত সহজে আত্মসংযমের অবস্থা লাভ করা যায়। বাসনার প্রকৃতিসম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিয়া অথবা শান্ত সমাহিত ও অবিচলিত মনের সহিত বিষয়ভোগ হইতে উৎপন্ন ক্ষণস্থায়ীসুখের তুলনা করিয়া ঐরূপ অবস্থা লাভ করা যায়। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে ইন্দ্রিয়সুখ অথবা কাম ও বাসনার দাসত্ব আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ নহে, নীচ পশুপ্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ ও ব্রহ্মস্বরূপতার বিকাশই আমাদের আদর্শ ও জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

ধ্যান ও ধারণা আত্মসংযম লাভের অন্যতম উপায়। অতএব আমাদের মনকে পরমাত্মার প্রতি নিবিষ্ট করিতে এবং সে সময়ে অন্য কোন বাসনা অথবা চিন্তা দ্বারা মন যাহাতে আদৌ বিচলিত না হয় সেই চেষ্টা করিতে হইবে।[৩] যাঁহারা স্যর এডুইন্ আর্নল্ডের 'লাইট অফ এসিয়া' (*Light of Asia*) নামক ইংরাজী কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের স্মরণ থাকিতে পারে বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমতলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন তখন নানা সুপ্ত সংস্কার তাঁহার মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে উহাদিগকে মূর্তিমান্ পাপপুরুষ মারের সহচর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেব সেই সময়ে বলিয়াছিলেন: "পরাজিত হইয়া

৩। তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" —মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৫

সামান্য ইন্দ্রিয়সুখের জন্য লালায়িত ক্রীতদাসের ন্যায় হীন জীবনযাপন করা অপেক্ষা রণক্ষেত্রে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে মৃত্যুলাভও শ্রেয়স্কর” এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা বুদ্ধদেব আত্মজয় করিয়াছিলেন। যে কোন ব্যক্তি ঐরূপ ঐকান্তির দৃঢ়সঙ্কল্প ও চরিত্রবলসম্পন্ন হইবেন তিনিও নিশ্চিত আত্মসংযমের অধিকারী হইবেন। যাঁহারা আত্মসংযম লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই একমাত্র এ জীবনে শাশ্বতী শান্তি, ও অশেষ আনন্দ ভোগ করেন এবং সর্বধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সেই পরম ও দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ধ্যান ও ধারণা ॥

ইন্দ্রিয়সংযম, রিপুদমন ও মানুষের অন্তর্নিহিত দিব্যশক্তিসমূহ বিকাশের উপরে প্রত্যেক নরনারীর আধ্যাত্মিক জীবন নির্ভর করে। রুচির ভিন্নতা অনুসারে এরূপ অধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার সাধনপ্রণালীও বিভিন্ন। এই সাধনপ্রণালী বা পদ্ধতিগুলিকে সংস্কৃতভাষায় 'যোগ' বলে। ইহাদের মধ্যে ধ্যান ও ধারণার পথ অথবা সাধনপ্রণালীকে সংস্কৃত ভাষায় 'রাজযোগ' বলে। সত্যানুভূতির ইহা রাজপথ বা প্রশস্ত উপায়। 'রাজযোগ'-শব্দ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 'রাজ' অর্থে প্রধান এবং 'যোগ' অর্থে ধারণা বা মনের কেন্দ্রীকরণ। এই ধারণা অর্থ চিত্তকে একাগ্র করার প্রণালী। যোগের অন্যান্য প্রণালী অপেক্ষা ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কারণ ধারণা ব্যতীত কোন চেষ্টা সিদ্ধ হইতে পারে না। ধারণার দ্বারা যে শক্তির বিকাশ হয় তাহা অপেক্ষা জগতে আর কোন উচ্চতর শক্তি নাই। ধারণার অভ্যাসে যে শক্তি লাভ হয় তাহা বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় জড়শক্তির উপরে প্রভুত্ব করিতে পারে। রাজযোগী বলেন যেইস্থানে তিনি চিন্তারাশিকে কেন্দ্রীভূত করেন সেইস্থানে প্রাকৃতিক কার্যাবলীকে স্বীয় আয়ত্তে আনিতে পারেন। রাজযোগের মতে মন সমগ্র বিশ্বের সর্বপ্রধান শক্তি বা সর্ব বস্তুর নিয়ামক। ভারতীয় যোগীগণ যে অমিত মানসিক

শক্তির অধিকারী বলিয়া পরিচিত, বর্তমান যুগের বিশ্বাস বলে ও মানসিক শক্তির সাহায্যে রোগ আরোগ্যকারিগণ (Faith-healers and Mental-healers) ও খৃষ্টান সায়েন্টিষ্টগণ (Christian Scientists) তাহার শতাংশের একাংশ মাত্র আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন।[১]

মনের সমস্ত শক্তি যথাযথভাবে পরিচালিত ও কোন বাহ্য-বস্তুতে প্রয়োগ ও সন্নিবিষ্ট করা হইলে সেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের নিয়ামক প্রাকৃতিক নিয়মসমূহও আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। চারিদিকের বিবিধ বস্তুর প্রকাশকারী বৈদ্যুতিক আলোকের রশ্মিরাশির ন্যায় মনের সমস্ত শক্তিও নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। একটি বৈদ্যুতিক আলোক তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুকে আলোকিত করে কিন্তু যদি আমরা উহার রশ্মিরাশিকে একস্থানে কেন্দ্রীকৃত করিবার কৌশল অবগত হইয়া সেই কেন্দ্রীভূত আলোক-প্রবাহকে বহুদূরবর্তী কোন বস্তুর উপর নিক্ষেপ করিতে পারি তাহা হইলে তাহার দ্বারাই সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হইয়া উঠিবে। সন্ধানী-আলোক বা সার্চলাইটে (search light) ঠিক এই প্রণালীই অবলম্বন করা হয়। যোগীর কেন্দ্রীভূত বা একাগ্র

১। খৃষ্টিয়ান সায়েন্টীষ্ট, ফেথ হিলার্স এবং মেণ্টাল হিলার্স আমেরিকা ও য়ুরোপের নবোদ্ভুত সম্প্রদায়। ইহারা দাবী করেন যে, যীশুখৃষ্ট অথবা অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় তাঁহারাও অলৌকিকভাবে লোকের যে কোন রোগ সারাইয়া দিতে পারেন।

মনকে আমরা একটি মানসিক সার্চলাইটের সহিত তুলনা করিতে পারি। সাধারণ দীপের এবং সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত প্রখর আলোকে যেইরূপ প্রভেদ, সাধারণ মানবের বিক্ষিপ্ত মন ও যোগীপুরুষের একাগ্র মনের সহিতও ঠিক সেইরূপ প্রভেদ। যোগী তাঁহার মনের এই সার্চলাইট অজ্ঞাত ও অদৃশ্যলোকে যে কোনও দূরত্বের মধ্যে সূক্ষ্মতম বস্তুগুলির উপর নিক্ষেপ করিতে এবং সেই সেই বস্তুসম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সহজে অবগত হইতে পারেন। যোগীর সেই একাগ্র মন আবার অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত হইলে অন্তঃপ্রকৃতির সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলি উদ্ভাসিত হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিয়ামক যাবতীয় নিয়মকৌশলও আবিষ্কৃত হয়। অল্লাধিক পরিমাণে প্রত্যেক ব্যক্তির এই ধারণা-শক্তি আছে এবং প্রত্যেকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের দৈনন্দিন জীবনে ইহা প্রয়োগ করে। ধারণা অথবা একাগ্রতা আমাদের নিকট সাধারণতঃ 'মনোযোগ' (attention) নামে পরিচিত। মনোযোগ না দিলে আমরা যাহা দর্শন, শ্রবণ অথবা অনুভব করি তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে কখনই পারি না। কোনও পুস্তক পড়িবার সময়ে যদি পাঠ্য বিষয় হইতে আমাদের মন অন্য কোন ব্যাপারে চলিয়া যায় তাহা হইলে চক্ষু শুধু যন্ত্রের ন্যায় সেই অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া যাইবে কিন্তু সে পাঠ্য বিষয়ের কোন অর্থ বা তাৎপর্য্যই আমরা আদৌ জানিতে পারিব না। যেমন কেহ কোন কথা

বলিবার সময় আপনি অন্যমনস্ক থাকিলে উচ্চারিত বাক্যগুলি আপনার কর্ণে প্রবেশ করিবে, উচ্চারিত বাক্যের বায়ুকম্পন শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলি দ্বারা মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে নীত হইয়া সেখানকার কোষশ্রেণীতে আণবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিবে এবং এই রূপে শব্দপ্রতীতির জন্য আবশ্যকীয় শরীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হইবে, কিন্তু মনোযোগের অভাবে আপনি উহা শুনিতে পাইবেন না। কোন বক্তৃতা শুনিবার সময়ে বক্তৃতা অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবিষ্ট থাকিলে বক্তৃতার ভাবরাশিকে আপনি হৃদয়সঙ্গম করিতে পারিবেন না। এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ানুভূতির প্রত্যেক ব্যাপারে আপনি দেখিতে পাইবেন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না থাকিলে প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই অনুভব করা যায় না।

মনোযোগশক্তি আবার সম্পূর্ণরূপে একটি অর্জিত বৃত্তিমাত্র নহে, উহা প্রধানতঃ প্রকৃতির একটি বিশেষ দান। জন্মাবস্থা হইতেই অনেকের মধ্যে এই শক্তিটিকে আবার সমধিক পরিপুষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। যেইস্থানে মনের বিকাশ সেইস্থানে এই মনযোগশক্তির অল্পাধিক অভিব্যক্তি দেখা যায়, কেননা ইহা মনের একটি স্বতঃবিকশিত বৃত্তি। মানবের ন্যায় ইতর প্রাণীদের মধ্যেও এই একাগ্র মনোযোগশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। তবে উহাদের মধ্যে কেবল পরিমাণের তারতম্যে, প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য অবশ্য সেখানে

কিছু নাই। সকল প্রাণীই প্রথমত নিজ নিজ আহার অন্বেষণের প্রতি মনোযোগ দেয়। শকুনি তাহার শিকারে মনোযোগ নিবিষ্ট করে এবং দূর হইতে শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর পতিত হয় ও তাহাকে আক্রমণ করে। ইন্দুরকে ধরিবার সময় বিড়াল অথবা শিকার আক্রমণ করিবার সময় ব্যাঘ্র প্রথমে মনকে একাগ্র করে, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূর করিয়া দেহ ও মনের বিক্ষিপ্ত যাবতীয় শক্তিকে সে একস্থানে কেন্দ্রীকৃত করে এবং নিজের বাসনা চরিতার্থ করিতে কৃতকার্য্য হয়। সেই সময় এই শিকারী জন্তুদের মনোযোগ এরূপভাবে কেন্দ্রীভূত বা একাগ্র হয় যে, অবশেষে শিকারের লক্ষবস্তু ভিন্ন অন্য কিছুই আর তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে না। শিকারীরাও এই ব্যাপারটি সুন্দরভাবে জানে এবং সেজন্য বন্যজন্তুর শিকারে বহির্গত হইয়া তাহারা ঐ সুযোগটি অবলম্বন করে। প্রাচীন-কালে ভারতের কোন এক মহাযোগী একদিন দেখিলেন নদীতীরে একটি বক নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে এবং একটি মৎস্যের উপর তাহার মনোযোগ এরূপ গভীরভাবে সন্নিবিষ্ট যে তাহার পশ্চাতে তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত শিকারীর প্রতি তাহার আদৌ লক্ষ্য নাই। ইহা দেখিয়া যোগী বলিয়া উঠিলেন: "হে বক, তুমিই আমার একাগ্রতা শিক্ষার গুরু; চিত্তের একাগ্রতা সাধনার সম্বন্ধে আমি তোমার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিব"। শিকারী জন্তুগণ যেভাবে আহার সংগ্রহ করে তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় একাগ্রতা অথবা মনোযোগ

তাহাদের পক্ষে কতদূর প্রয়োজন। হঠাৎ কোন শব্দে অথবা কোনরূপ বাধাদ্বারা যদি তাহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় তবে শিকার পলায়ন করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। নিম্নশ্রেণীর প্রানীদিগের স্বতঃপ্রবৃত্ত মনোযোগশক্তির এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে মনের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ও কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে পরিচালিত হয়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সজাগ ও সম্পূর্ণ সংযত থাকে। কর্মশীলতাও একটি নির্দিষ্ট শারীরিক বিষয়ে নিবিষ্ট হয় এবং দেহের চঞ্চলতা স্তব্ধ হইয়া যায়। নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে প্রাণিগণ এরূপ কার্যপ্রণালীর আবশ্যকতা শিক্ষা করিয়াছে।

মনঃশক্তির যে বিচিত্রধারা বা গতি সমগ্র দেহযন্ত্রটিকে বিভিন্ন দিকে গতিশীল করে তাহাকে একটি কেন্দ্রে নিবদ্ধ করিয়া সেই কেন্দ্রীভূত শক্তিপুঞ্জকে কোন একটি বিশেষ দিকে পরিচালিত করিলে মনের শক্তি বর্ধিত হইয়া থাকে। সেই মানসিক শক্তি কখনও দৈহিক বা পৈশিক (muscular) শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা ঐ প্রকার স্বতঃবিকশিত মনোযোগশক্তির অভিব্যক্তি সর্বদা দেখিতে পাই। যে শিল্পী স্বীয় কার্যে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া তাহাতে বুদ্ধি ও মনকে একত্রে নিবদ্ধ করিতে পারেন, তিনি মনুষ্যচালিত যন্ত্র (machine) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মোটরগাড়ীর চালক তাহার কার্যে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ না করিলে কখনও মোটরগাড়ী চালাইতে পারে না। এই বিষয়টি সুবিদিত এবং তাহার প্রমাণ এই যে

মোটরগাড়ী-চালকগণের যাহাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয় সেজন্য তাহাদিগকে রাস্তার মধ্যে আরোহীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে দেওয়া হয় না। অশ্ব অথবা সাইকেলে আরোহণকারী ব্যক্তি যদি চারিদিকের বস্তুর প্রতি তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেয় তাহা হইলে হঠাৎ তাহার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কোনও নিপুণ ও অভিজ্ঞ দাবা-খেলোয়াড়কে একসঙ্গে ছয়জনের সহিত খেলায় নিযুক্ত থাকিবার সময় অতি অদ্ভূত একাগ্র মনোযোগের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। নৃত্য, গীত, ছবি আঁকা প্রবন্ধ রচনা বা অন্য কোন কার্যে কেহই আশানুরূপ সাফল্য লাভে করিতে পারে না যদি না সে তাহার নিজকার্যে মনের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে। মনের শক্তিকে একাগ্র না করিলে কোন বিখ্যাত শিল্পী, ভাস্কর, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, জ্যোতির্বিৎ, গায়ক অথবা সাহিত্যিকের অভ্যুদয় সম্ভব হইত না। এই শক্তি যতই বিকশিত হইয়া উঠে ইহার ফলও ততই আশ্চর্যজনক হয়। প্রকৃতিরাজ্যের নানাবিধ আবিষ্কার, বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও দ্রব্যাদির নির্মাণ, আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সে সমস্তই বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকদের অসাধারণ একাগ্র মনোযোগশক্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজন্ম প্রতিভাশালী কোন ব্যক্তি যদি অকস্মাৎ এই শক্তিহইতে বঞ্চিত হন তাহা হইলে তাঁহারও কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের ন্যায়

হইয়া পড়িবে। কারণ যাহাকে আমরা প্রতিভা বলি, প্রকৃতপক্ষে তাহা মনেরই বিরাট একাগ্রতা শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই শক্তি দ্বারা মনের সমস্ত বৃত্তি নির্দিষ্ট কোন এক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া এরূপ আশ্চর্যফলপ্রদান করে যে, আমরা সেই অদ্ভুত কার্যদক্ষতার প্রকাশক অথবা সেই শক্তির অধিকারীকে জনসাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরের মনুষ্য বলিয়া গণ্য করি।

আবার যদি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কেবল এই কেন্দ্রীভূত মনোযোগশক্তির উৎকর্ষ ও বিকাশসাধন করিতে পারে তাহা হইলে সেও জগতের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের অন্যতম বলিয়া গণ্য হয়। মনের একাগ্রতাশক্তি এই প্রকারই অপরাজেয়। ইহা আমাদের সমস্ত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ এবং সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদের জীবন এই মনোযোগ-শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই শক্তি সামান্য পরিমাণে প্রয়োগ না করিলে যে সকল আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বিপদরাশি আমাদের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইতে আমরা পরিত্রাণ পাই না। তখন আবার অন্যের দ্বারা রক্ষিত না হইলেও আমরা প্রাণ রক্ষা করিতে পারি না। তাহা ছাড়াও আমাদের জীবনে শতকরা নিরানব্বইটি ব্যাধি ও আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণও জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মসমূহের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ অমনোযোগিতা মাত্র।

মানবশিশু তাহার জীবনের প্রথম অবস্থায় কোন চাকচিক্যময় দ্রব্য, জননী কিংবা ধাত্রীর চক্ষু ও মুখের প্রতি

একদৃষ্টে তাকাইয়া অন্তর্নিহিত এই মনোযোগ শক্তির পরিচয় দেয়। শিশুদের এই সাধারণ, অপরিণত ও স্বতঃ-বিকশিত মনোযোগশক্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে ক্রমশ পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

ইতর প্রাণী, শিশু ও অজ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্ষীণভাবে প্রকাশমান সেই স্বতঃবিকশিত মনোযোগশক্তি প্রথমে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাণধারণ প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমে যখন শিক্ষা ও সাধন দ্বারা আমরা সাধারণ জীবের স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হই তখন আমাদের মনোযোগশক্তিও বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়, তখন কেবল ইন্দ্রিয়াকর্ষক বা শরীররক্ষার উপযোগী বস্তুতে মনোযোগ না দিয়া বুদ্ধি ও উচ্চতর প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট বিষয়সমূহের উপরও মনোনিবেশ করিতে আমরা শিক্ষা করি। প্রকৃতপক্ষে তখনই স্বতঃপ্রবৃত্ত অথবা ইচ্ছা ও বুদ্ধির দ্বারা সুসংযত ও সুপরিচালিত মনোযোগের ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে। তাহার পর আবার উহা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, মানসিক শক্তিলাভ ও নব নব চিন্তাস্রোতের সৃষ্টি হয়।

এই একই মনোযোগশক্তি নৈতিক নিয়মাবলী পালনে এবং আমাদের সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের কল্যাণকর সৎকর্ম সাধনে নিয়োজিত হইলে আমাদের মনের আরও অধিকতর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার যখন আমাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত মনোযোগ আধ্যাত্মিক জীবনের অভিমুখে পরিচালিত হয়

তখন উহা আমাদিগকে পুণ্যবান ও ধার্মিক করিয়া আমাদের অন্তর চরিত্রের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া থাকে। পরিশেষে উহা একাগ্র হইয়া আত্মা অথবা পরমেশ্বরের ধ্যানে অভিনিবিষ্ট হইলে মানুষ দিব্যজ্ঞান লাভ করে। এই দিব্যজ্ঞান জীব লাভ করিলে অবিদ্যা, মোহ ও স্বার্থপরতার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে এবং নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হয়। এই আধ্যাত্মিক চরমাবস্থার নাম 'সমাধি' অথবা ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি। অতএব যে পরিমাণে মানবজাতিকে এই বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা উন্নতির অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে, যে কোন কার্য হইতে দৈহিক এবং নৈতিক কল্যাণ, মানসিক ও আধ্যাত্মিক-উন্নতি এবং উপলব্ধি সম্ভব হইয়াছে সে সমস্তই সুনিয়ন্ত্রিত ও একাগ্র মনোযোগশক্তির ফল বা বিকাশমাত্র। দার্শনিক মনীষী এমার্সনও (Ralph Waldo Emerson) বলিয়াছেন : "একাগ্রতাই মানবজীবনের একমাত্র কল্যাণ। রাজনীতি, যুদ্ধকৌশল, বাণিজ্য এবং মানবজাতির অন্য সমস্ত কর্মক্ষেত্রে একাগ্রতাই একমাত্র সমস্ত শক্তির উৎসস্বরূপ"। যে স্বতস্ফূর্ত মনোযোগের গতি প্রকৃতির দানস্বরূপ তাহা ইচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টার দ্বারা পরিচালিত হইলে যাবতীয় দুর্জ্ঞেয় সত্য ও বিশ্বের নির্বিশেষ সত্তাকে ধারণা করা যায়। বাস্তবিক শক্তিকে সংযত করিরার কৌশল অবগত থাকিলে ঐ সামান্য শক্তিই সুবিপুল ও সুদৃঢ় হয়। বাগানের মালি যেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লব ক্রমাগত কাটিয়া ছাঁটিয়া গাছের সমস্ত রসটুকু

বহুশাখা ও প্রশাখায় বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া দুই একটি সতেজ পুষ্পমুকুলেই মাত্র কেন্দ্রীকৃত করে, যোগীও সেইরূপ তাঁহার মনের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিরাশিকে সংযত এবং সমগ্র আন্তর শক্তিপুঞ্জকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করে। যোগী মনের অন্য সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া এরূপ শক্তি সঞ্চয় করেন যে, প্রতি কার্যে তাহা অতি অদ্ভুত ফল প্রদান করে।

ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনোযোগকে আয়ত্ত বা কেন্দ্রীভূত করাকে সংস্কৃত ভাষায় 'ধারণা' বলে। পরিপূর্ণ ধারণাশক্তি অথবা একাগ্রতা হইতে অন্তর ও বহির্জগতের উপর পূর্ণ-আধিপত্য লাভ করা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে এই প্রকার উচ্চাঙ্গের ধারণাশক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। মন যখন বিভিন্ন রূপধারণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেহের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন একটি বস্তুবিশেষে অভি-নিবিষ্ট হইয়া স্থিতিলাভ করে তখনই তাহাকে 'ধারণা' বলে।[১]

ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা অস্থিরতা, কুপ্রবৃত্তি,—নীচ বাসনা ও চিত্তবিকার প্রভৃতি নিরোধ করিলে মনের সমস্ত শক্তিকে এক কেন্দ্রে আনয়ন ও কোন লক্ষ্য বস্তুতে নিবিষ্ট করা যায় এবং

১। "দেশবন্ধস্ত চিত্তস্য ধারণা"।—পাতঞ্জলদর্শন ৩/১ ; বেদান্তসারেও (২০৫-২০৬) বলা হইয়াছে : "ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়ে প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারং। অদ্বিতীয়বস্তুনি অন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা।"

সেই প্রণালীকে 'ধারণা' বলে। একাগ্র মনঃশক্তিকে যে নির্দিষ্ট বস্তুতে প্রয়োগ করা হয় সেই নির্দিষ্ট বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে ঐ প্রকার ধারণার ফলও বিভিন্ন হইয়া থাকে। সর্বশ্রেষ্ঠ ফল-লাভের জন্য ধারণার প্রধান সহায় প্রথমতঃ ধারণার বিষয় ও সম্বন্ধ নির্ণয়ে যথার্থ বিবেক বা বিচার; দ্বিতীয়ত ঈপ্সিত বস্তুসম্বন্ধে স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট জ্ঞান; তৃতীয়তঃ, আত্মবিশ্বাস এবং চতুর্থত, দৃঢ়সঙ্কল্প, স্থির উদ্দেশ্য ও অধ্যবসায়। মনীষী ডিস্‌রেলী (Disraeli) বলিয়াছেন: "দীর্ঘকালব্যাপী গভীর চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, স্থিরসঙ্কল্পবান ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি যে ইচ্ছাটিকে পূর্ণ করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন কোন ব্যক্তিই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না"। যোগীর মতে দৃঢ় ও স্থিরসঙ্কল্প, কৃতনিশ্চয় এবং উদ্দেশ্যসাধনে অটল মন অল্পকালের মধ্যেই উন্নত ধারণাশক্তি লাভ করে।

স্বরূপসত্তার রহস্য উন্মোচন অথবা আত্মজ্ঞানলাভে মানবের পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। সেইজন্য প্রকৃত যোগী সংসারী ব্যক্তিদিগের ন্যায় নশ্বর সুখের অন্বেষণে মনকে একাগ্র ও নিয়োজিত করিতে চাহেন না। এমন কি ক্ষণকালের জন্যও অতৃপ্তিকর বস্তুগুলিকে ত্যাগ করিবার জন্য তিনি মানসিক শক্তি ক্ষয় করেন না। তিনি অপরের ব্যাধিতে মনোনিবেশ করিয়া মানসিক শক্তিগুলিকে বিক্ষিপ্ত করিবার কোন চেষ্টাও করেন না। তথাকথিত সভ্যজগতের একচেটিয়া ব্যবসাদির ন্যায়

অন্যের ক্ষতি করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যোগী কখনও নিজের সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রভূত করেন না অথবা যাদুবিদ্যা প্রভৃতি অভ্যাস করেন না। প্রকৃত যোগী কখনই ঐশ্বর্যের ধ্বংসশীল ছায়ামূর্ত্তির অনুসরণে অসার পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মনকে একাগ্র করিতে ইচ্ছুক নহেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য এই একাগ্রতাশক্তিকে ক্ষয় না করিয়া বহুল পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া রাখা আবশ্যক। যোগীদের মতে উক্ত প্রকার বিক্ষিপ্ত মন অথবা একাগ্রহীনতাদ্বারা শক্তির অপচয় হয়। পার্থিব সমস্ত বস্তুই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ। জাগতিক বস্তুসকল কেন যে ধর্মোন্নতির অন্তরায় এ বিষয় পৃথিবীতে অতি অল্প লোকে বুঝিতে পারে। কিন্তু যিনি মিথ্যা হইতে সত্যকে, অসৎ হইতে সৎকে এবং জড়বস্তু হইতে চৈতন্য অথবা আত্মাকে বিচার দ্বারা পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই যথার্থ যোগী। প্রকৃত যোগী ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বস্তুলাভের জন্য অথবা শক্তিক্ষয় করিতে ইচ্ছা করেন না। জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ লাভ করাই তাঁহার একমাত্র অভিলাষ। সেজন্য তিনি পরম-সত্যের বা বিশ্বের অখণ্ড সত্তাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার চিন্তা নিবিষ্ট করেন। এরূপ ধারণার ফলে সমাধি অথবা চিত্তের সমাহিত ও অতীন্দ্রিয় অবস্থালাভ হয় এবং কেবলমাত্র সেই অবস্থাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার অথবা ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করা সম্ভব।

হিন্দু মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের মতে সমস্ত মানসিক অবস্থাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ; যেমন (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, (৪) একাগ্র ও (৫) নিরুদ্ধ। প্রথম, ক্ষিপ্ত অবস্থায় মন চতুর্দিকে ছড়ানো অর্থাৎ সর্বদা চঞ্চল থাকে। এইপ্রকার মন কোন-না-কোন কাজে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতে চায়, কখনও শান্ত থাকে না। এইরূপ অবস্থায় সমগ্র মন মত্ত হস্তীর ন্যায় যথেচ্ছভাবে যে কোন দিকে ধাবিত হয়। তখন তা লক্ষ্যভ্রষ্ট অথবা উদ্দেশ্যহীন হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায় এবং কিছুতে বশীভূত হয় না। সুতরাং যাহাদের মানসিক অবস্থা এইরূপ তাহারা মনের উদ্দেশ্যহীন চাঞ্চল্য-দমনের চেষ্টা করে না, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে উহাই তাহাদের সহজ অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থাগুলি অস্বাভাবিক ও বিকৃত। কিন্তু তাহাদের মনযন্ত্র এতই উদ্দামগতিতে ক্রিয়া করিতে থাকে যে, সেই গতিকে সামান্যভাবে হ্রাস করিতে ও ক্ষণিক বিশ্রাম-লাভ করিতে বলিলে তাহারা আপনাদের অস্তিত্বের লোপ হইবার অথবা স্বাতন্ত্র্য নাশের ভয়েও ভীত হয়। তাহাদের ধারণা যে বিশ্রামের অর্থ নিদ্রা কিংবা মৃত্যু।

দ্বিতীয় শ্রেণী হইল মূঢ় অর্থাৎ নির্বোধ, বিহ্বল ও বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা। যাহারা জড়বুদ্ধি, অলস, নিষ্ক্রিয় ও নির্বোধ তাহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইপ্রকার অবস্থায় মেধা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি যেন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

যাহা হউক এই অবস্থা-দুইটি যেন মনের অস্থিরতা ও জড়তার চরম সীমা। তৃতীয় অবস্থার নাম 'বিক্ষিপ্তাবস্থা', অর্থাৎ মন এই অবস্থায় কখনও কর্ম্মশীল আবার কখন বা জড়বৎ থাকে। চতুর্থ অবস্থার নাম একাগ্র অর্থাৎ একনিষ্ঠ অবস্থা অথবা কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্টতা। পরিশেষে যে সুনিয়ন্ত্রিত ও একাগ্রীভূত অবস্থায় সর্বপ্রকার কর্মপ্রবৃত্তি রুদ্ধ হয় এবং যাহা দ্বারা মন তাহার সমস্ত সীমার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় ভূমিতে সমাহিত হয় ও ব্রহ্মানুভূতি লাভ করে তাহাই 'নিরুদ্ধ' নামক পঞ্চম অবস্থা। প্রথম অবস্থা-তিনটি সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, উহাদের কোনটিই আধ্যাত্মিক জীবনে সহায়তা করে না। শেষোক্ত অবস্থা-দুইটিই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। চতুর্থ অবস্থায় সমগ্র মন যখন একটি বিষয়গত বা একাগ্র হয় তখন আমরা সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। তখন মনের অশান্তিকর বিকারগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং পার্থিব বিষয় ও ইন্দ্রিয়সুখভোগের বাসনা-গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া যায়, মানসিক সমতা আর নষ্ট হয় না। মনের এই চতুর্থ অবস্থা হইতে ক্রমশ পঞ্চম অবস্থা লাভ হয়। তখন মনের উপর মানুষের সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ হয়। অতএব যাঁহারা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করিতে অভিলাষী তাঁহাদিগকে শেষোক্ত অবস্থা দুইটিতে উপনীত হইবার জন্য একান্ত প্রবলভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

ধারণার পঞ্চম স্তরে অতীন্দ্রিয় অবস্থা লাভ হইলে জ্ঞাতা বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়, কিন্তু অন্য সময়ে জ্ঞাতা চিত্তের বিকারের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কখনও ভাল কখনও বা মন্দভাবের উদ্রেক, কখনও মানসিক আবেগ, সুখ ও দুঃখকর অনুভূতি এবং কখনও বা স্থূলশরীর ও নানাপ্রকার দৈহিক ব্যাধির সহিত জ্ঞাতা তদাকার-কারিত হইয়া যায়। দেহ ও মনের বিকারগুলির সহিত আত্মার এই অভিন্ন ভাবের প্রতীয়মানতা অথবা একত্বের অধ্যাস[১] আমাদের যাবতীয় বন্ধন ও দুঃখ-কষ্টের কারণ। শোক ও দুঃখের জ্ঞাতা জীবাত্মা উহাদের (শোক ও দুঃখের) সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিলে শোক-দুঃখভোগীরূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তু হইতে সর্বদা স্বতন্ত্র ও পৃথক। এই অবস্থার দৃষ্টান্ত এই যে, একটি লৌহপিণ্ড অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বহুক্ষণ থাকিলে উত্তপ্ত ও লোহিত দেখায়। অজ্ঞ ব্যক্তি জ্বলন্ত লৌহপিণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহাকে অগ্নি বলিয়া ভ্রম করে। বুদ্ধি, মন ও দেহকে লৌহপিণ্ডের সহিত এবং চৈতন্যকে অগ্নির সহিত তুলনা করা যায়। বুদ্ধি, মন ও দেহ আত্মার প্রকৃত সত্ত্বা চৈতন্যরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত বা প্রজ্বলিত হইয়া অজ্ঞানীর নিকট চৈতন্যময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভ্রমের জন্য দেহ ও মনের বিকারকে নিত্যশুদ্ধ

১। এই 'অধ্যাস' বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় এবং কিরূপে বা তাহা হয় আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। যেইরূপ অগ্নি হইতে লৌহপিণ্ডকে পৃথক করিলে আমরা তাহার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হই সেইরূপ সমাধির অবস্থায় চৈতন্যরূপ অগ্নি হইতে চিত্তরূপ লৌহপিণ্ডকে পৃথক করিয়া দেখিলে তাহারও প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সে সময়ে আমরা উপলব্ধি করি উহাও (চিত্তও) লৌহপিণ্ডের ন্যায় স্বরূপতঃ জড়, কেবলমাত্র শুদ্ধচৈতন্য বা আত্মার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া জীবন্ত অথবা সচেতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারাও ইহা বুঝানো যাইতে পারে। যেমন একখণ্ড বিশুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট উজ্জ্বলবর্ণ কোন রঙীন বস্তু থাকিলে স্ফটিক তাহার উপর রঙের দ্বারা এরূপভাবে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয় যে, কেবলমাত্র অতি সূক্ষ্মদর্শী বুঝিতে পারেন শুদ্ধ স্ফটিকের স্বভাবত কোন বর্ণ নাই। এইরূপ আসক্তি, চিন্তা, ভাব ও বাসনা প্রভৃতি চিত্তের সতত পরিবর্তনশীল বিকারসমূহের দ্বারা চৈতন্য বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আবৃত থাকে এবং আত্মারূপ শুদ্ধ স্ফটিকটি সত্য সত্যই ঐ সকল বিকারগ্রস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। প্রতীয়মান পদার্থ হইতে সত্যবস্তুকে যথার্থভাবে পৃথক করিবার যে বিচারশক্তি তাহাই আমাদিগকে উক্ত উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত তত্ত্ব জানাইয়া দেয়। যদি কেহ মুহূর্তের জন্য তাঁহার প্রকৃত স্বরূপকে মানসিক ক্রিয়াসমূহের পরিবর্তনশীল প্রতিবিম্ব হইতে মুক্ত করিতে পারেন তাহা হইলে সেই মুহূর্তে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি

করিতে পারেন তিনি আর ভ্রমে পতিত হইবেন না এবং দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন বিকারসমূহের সহিত নিজেকে আর এক বলিয়াও মনে করিবেন না।

এই উপলব্ধিলাভের একমাত্র উপায় ধ্যান ও ধারণার অভ্যাস। মনের ধারণাশক্তি বৃদ্ধি করিবার বিভিন্ন প্রণালীও আছে। যেসকল ধর্মগুরু বহুকাল ধরিয়া যাগযজ্ঞের সমস্ত প্রণালী সাধন করিয়াছেন এবং যাঁহাদের জীবন পবিত্র নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক তাঁহাদের নিকট হইতেই সাধনার সেই প্রণালীগুলি শিক্ষা করা উচিত। যে কোন ব্যক্তি রাজ-যোগ বা যোগশাস্ত্রীয় কোন পুস্তক হইতে অবশ্য কয়েকটি প্রণালী অতি সহজেই শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যোগসিদ্ধ গুরুর সাহায্য ভিন্ন সেগুলি অভ্যাস করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। একমাত্র মানসিক অথবা শারীর-মানসিক (physico-mental) উপায়ে ধারণাশক্তি লাভ করা যায়। নির্দিষ্ট কোন বিন্দু, ভাব বা অনুভূতিবিশেষে মনকে স্থির করাব চেষ্টা হইতেই মানসিক একাগ্রতার সাধন আরম্ভ হয়। মনে কর যখন তুমি তোমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে মন স্থির করিতে চেষ্টা করিতেছ তখন তোমার কেবলমাত্র কনিষ্ঠ অঙ্গুলি অনুভব করিবে এবং সমগ্র শরীরে বিক্ষিপ্ত মানসিক শক্তিসমূহকে একত্র করিয়া সেই অঙ্গুলিতে কেন্দ্রীভূত করিবে। সে সময়ে অন্য কোন চিন্তা অথবা কোন ভাব মনোমধ্যে তোমার উদিত হইতে দিবে না এবং তাহার দ্বারা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত

হইতে অথবা অন্য কোনদিকে মনকে যাইতেও দিবে না। কয়েকদিন যাবৎ অভ্যাসের পর দেখিবে যে, তুমি মনকে আয়ত্ত ও নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে স্থির করিয়া রাখিবার কিঞ্চিৎ শক্তি লাভ করিয়াছ। এইরূপে স্বেচ্ছাকৃত মনোযোগশক্তির উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিলে তুমি বাহিরের বা অন্তরের সাকার অথবা নিরাকার, মূর্ত বা অমূর্ত, জড় বা আধ্যাত্মিক যে কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করিতে পারিবে। পূর্ণ ধারণাশক্তির প্রকাশ অথবা একাগ্রতার সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রবাহও পরিবর্তিত হইয়াছে এবং উহা ধীর ও শান্ত গতিবিশিষ্ট হইয়া হয়তো সেই সময়ের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার লুই (Dr. Lewes) নামক একজন বহুদর্শী ফরাসী দার্শনিক বলেনঃ "মনোযোগশক্তি লাভ করার অর্থ শ্বাসপ্রশ্বাসের ধারাবাহিক প্রবাহের সহিত মানসিক অবস্থার সমতা রক্ষা করিতে শিক্ষা করা"। মনের ক্রিয়া বা গতির সহিত ফুসফুসের ক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মানসিক কর্মপ্রবণতা বা চঞ্চলতাকে দমন করিতে পারিলে ফুসফুসের ক্রিয়াকেও যেরূপ সংযত করা যায় আবার ফুসফুসের ক্রিয়াকে আয়ত্ত করিতে পারিলে মনও অপেক্ষাকৃত সেরূপ অল্প চেষ্টাতে আয়ত্ত হয়। ফুসফুসের ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়—এমন কি দেহের প্রতি পরমাণু পর্যন্ত নিজের অধীন হয়। এইরূপে নিজের সাধনার দ্বারা মনের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ হইলে

দেহের যেকোনও স্থানে মনোযোগ নিবিষ্ট করিতে পারা যায়। তখন নানাবিধ অলৌকিক ভাব ও অতীন্দ্রিয় শক্তিরও বিকাশ হয়। শরীরের যে কোন অংশে মনোযোগ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ করিলে যে সহজে বেদনা অনুভূত হয় তাহা সকলের নিকট সুবিদিত। ঠিক ঐপ্রকার প্রণালীর দ্বারা দৈহিক বেদনা হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। আধুনিক যুগে মানসিক শক্তির বলে ব্যাধি আরোগ্যকারিগণ এরূপ ব্যাপারের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু তাঁহাদের অনেকে রোগশান্তির মূলকারণ নির্ণয়ে অক্ষম। দেহের ব্যাধিগ্রস্ত স্থানে মনের শক্তিকে একাগ্র করিয়া তাহার দিকে বিপরীত চিন্তাস্রোত চালিত করিলে দেহকে রোগমুক্ত করা যায়। অধুনা খ্রীষ্টান সায়েন্টিষ্টগণ (Christian Scientists) ও মানসিক শক্তির সাহায্যে চিকিৎসককারীরা (Mental healers) বিভিন্নভাবে এই প্রণালীটি সাধারণত প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐরূপ রোগ নিরাময় করিবার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে শক্তি কেহ কাহাকেও দান করিতে পারে না এবং উহা মানবের মনের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের অন্যতম। অন্যের মানসিক শক্তির সাহায্য লইয়া রোগমুক্ত হওয়া অপেক্ষা নিজেই নিজেকে নীরোগ করা ভাল। নিজের মনকে কখনও অন্য ব্যক্তির মনের দ্বারা অভিভূত হইতে দেওয়া উচিত নয়। যাহারা মানসিক শক্তিদ্বারা রোগ আরোগ্যকারিগণ (Mental healers) ও খৃষ্টান

সায়েন্টিষ্টদের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির জন্য গমন করে এবং নিজেদের মনকে অন্য মনের অধীন হইতে দেয় তাহারা জানে না প্রবলতর মনের সম্মোহনী শক্তিতে অভিভূত হইয়া তাহারা মানসিক অধোগতির পথে অগ্রসর হয়। এইভাবে লোকে অধঃপতিত হইয়া অন্য মনের দাস হইয়াছে এবং আত্মসংযমের সমস্ত শক্তি হারাইয়াছে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা অপরের মনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বেড়ায়, সেই সকল আত্মপ্রতারিত ব্যক্তিদের মনের অবস্থা বাস্তবিক কিরূপ শোচনীয়! এরূপ বিপদসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত বলিয়াই কখনও যোগীপুরুষেরা আপনাদের মনকে অন্যের মনের অধীন হইতে দেন না, বরং তাঁহারা অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা আপনার মধ্যে নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন করেন। প্রকৃত যোগী আপনিই আপনার প্রভু, তাঁহার আর অন্য কোন প্রভু বা চালক নাই। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ তাঁহার নিজের আজ্ঞাধীন। প্রকৃত যোগী যাবতীয় সূক্ষ্ম শক্তি ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করিবার সমস্ত বিধিই জানেন। ধারণাশক্তির সম্পূর্ণতা অথবা একাগ্রতা দ্বারা অর্জিত শক্তির বলে চৈতন্য বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ মানুষের যথাযথ উপলব্ধি ও জ্ঞান লাভ হয়। ধারণাই অবশেষে 'ধ্যানে' পরিণতি লাভ করে। কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শের প্রতি একটি চিন্তাস্রোতের অবিরাম ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে 'ধ্যান' বলে।[১] ধারণার অভ্যাসের দ্বারা মনের উপর

১। তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। —পাতঞ্জলদর্শন ৩।২

আধিপত্য লাভ করিয়া যদি আমরা চিন্তাস্রোতকে কোন একটি বিষয়ের উপর কিছুক্ষণের জন্য নিবিষ্ট রাখিতে পারি তাহা হইলেও বুঝিব আমাদের ধ্যান করিবার শক্তি লাভ হইয়াছে। এই অবস্থায় বাহিরের কোন কোলাহল অথবা বিরক্তিকর চিত্তবিকারের দ্বারা মন বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল হয় না।

ধ্যান-অভ্যাসকারিদিগের ব্যক্তিগত আদর্শের বিভিন্নতা অনুসারে ধ্যানের বিষয়টি আবার নানাপ্রকার হয়।[১] আত্ম-বিকাশের জন্য ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব উপলব্ধিই ধ্যানের যাবতীয় বিষয়সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "আমি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত আত্মা", "পরমাত্মার সহিত আমি অভিন্ন" বা "আমি এবং পরম পিতা এক (I and my Father are one)" এই সকল ভাবনাই ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ বা লক্ষ্যাভিলাষীদের বিশেষ সহায়তা করে। উচ্চ ধর্মানুভূতিপূর্ণ এই সকল বাণীকে ধ্যানাভ্যাসী প্রথমে মুখে মুখে ও পরে মনে মনে আবৃত্তি করিবে, উহার প্রকৃত অর্থের উপর মনকে একাগ্র করিবে এবং চিন্তা ও উপলব্ধির দ্বারা ঐ বিষয়ে ধ্যান করিবে। সমস্ত বিক্ষিপ্ততা হইতে মনকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরচিন্তার নিরবচ্ছিন্ন একটি স্রোতে পরিণত করিতে পারিলে তখনই কেবল ঠিক ঠিক ধ্যান করা সম্ভব হইবে। যদি সাধকের মন অন্য কোন বিরোধী চিন্তা, ভাব বা বাহিরের গোলযোগ হইতে চঞ্চল হয় তাহা হইলে দৃঢ়তার

১। যথাভিমতধ্যানাদ্বা।—পাতঞ্জলদর্শন ১।৩৯

সহিত উহাকে পুনরায় ইষ্টচিন্তায় নিবিষ্ট করিতে হয়। কোনরূপ কুচিন্তা উদিত হইলে সুচিন্তার উদ্দীপনা দ্বারা তাহা প্রতিহত করিবার জন্য সখ্য বা মিত্রভাবের উদ্রেক করিতে হয়। ঘৃণাকে জয় করিবার জন্য প্রেমের অনুশীলন এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি দমন করিবার জন্য ক্ষমাগুণের অভ্যাস করা উচিত। এরূপ অসৎ ও অনিষ্টকর চিন্তাসমূহ তাহাদের বিপরীতভাবের দ্বারা জয় করা যায়।[১] নিয়মিতভাবে প্রত্যহ আধঘণ্টাকাল ধ্যান অভ্যাস করিলে একমাস পরে সাধক দেখিবেন তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি পরিবর্তিত ও মন অনেকটা শান্ত হইয়াছে। যাহারা কখনও ধ্যান অভ্যাস করে নাই তাহাদের পক্ষে ইহা প্রথমে অতিশয় দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হইবে, কারণ মনের উদ্দাম কর্ম-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়ারূপ অভ্যাস ধর্মসাধনায় নূতন প্রবর্তিত সাধকের সকল চেষ্টাকে বিফল করিয়া দেয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা কখন জানে না এরূপ নানাবিধ চিন্তা ও ভাব স্বতঃই মনের অবচেতন স্তর বা সুষুপ্তাবস্থা হইতে চিত্তের উপর দেখা দিবে এবং তাহাদের প্রবল শক্তি প্রকাশ করিবে। নবপ্রবর্তিত সাধককে ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সহিত একাগ্রতালাভের প্রতিবন্ধকরূপ এই সমস্ত বিরোধী চিন্তা দমন করিতে হইবে এবং ইহাদের প্রতি তাহার মনকে আকৃষ্ট

১। (ক) বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম—পাতঞ্জলদর্শন ২ ৩৩
(খ) মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদরম্।—পাতঞ্জলদর্শন ১।৩৩
(গ) অক্রোধেন জিনে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।—ধর্মপদ ১৭।৩

হইতে দেওয়া মোটেই উচিত নহে। যে চিন্তার ধারা বা পারম্পর্য অনুসরণ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প তাহা হইতে মন যাহাতে বিচলিত না হয় সেজন্য তাহাকে কঠোরভাবে অধ্যবসায় শিক্ষা করিতে হইবে। নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি উপস্থিত হইয়া মনের চেতনস্তরে অল্পক্ষণ ক্রীড়া করে এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট না হইলে তাহারা পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু সাধক যদি তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয় তাহা হইলে মনোবৃত্তিগুলি আবার প্রবলতর হইয়া আবেগের (impluse) আকার ধারণ করে এবং সমস্ত মনটিকে বলপূর্বক বিপথে লইয়া যায়; অতএব ঐ সকল অনাহূত চিন্তা বা ভাবরাশির প্রশ্রয় না দিয়া সাধককে দৃঢ়ভাবে স্বীয় আদর্শ অথবা ইষ্টকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে।

ভগবান অথবা যীশুখৃষ্টের ন্যায় লোকগুরুগণ এবং অতীত ও বর্তমান কালের ধর্মসাধকদের মধ্যে কেহই ধ্যান অভ্যাস না করিয়া পূর্ণ শান্তিলাভ করেন নাই। পরিপূর্ণ মানসিক শান্তিলাভের ইহাই একমাত্র পন্থা। অর্থোপার্জন পানাহার এবং সামান্য দৈহিক বা মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় নানাপ্রকার কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা আমাদের মূল্যবান জীবনকে বৃথা নষ্ট করিয়া থাকি। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভাবিয়া দেখি না আমরা কি অমূল্য সুযোগ হেলায় হারাইতেছি। দেহের খাদ্য অন্বেষণে আমরা সর্বদা ব্যগ্র কিন্তু কখনও আত্ম-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করি না। যে সনাতন

শাশ্বত সত্য ঐকান্তিক ধ্যানের পরিণতির ফলে পূর্বতন সাধক ও যোগীদের শুদ্ধ নির্মল আত্মায় আনন্দ ও অমৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আনন্দ ও অমৃতের আস্বাদন করিবার জন্য তুমি তোমার আত্মার সাধনা কর। এই মহান উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তোমাকে প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে ধ্যান অভ্যাস করিতে হইবে। ধ্যান যেন তোমার জীবনে প্রতিদিন অপরিহার্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোন নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিকের সঙ্গলাভ করিয়া যতদূর সম্ভব তাঁহার উপদেশাবলী পালন কর এবং সেই আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া সাহসী যোদ্ধা ও প্রকৃত বীরের ন্যায় মনের চঞ্চল গতি এবং দুর্দমনীয় মনরূপ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ধ্যানের পথে অগ্রসর হও। সাধনার লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তুমি কখনও নিরস্ত হইও না। পরিশেষে তুমি নিশ্চয়ই বিশ্ববিজয়ী হইবে এবং অধ্যাত্মরাজ্য তোমার করতলগত হইবে। ধ্যানসিদ্ধি লাভ করিলে তুমি সমাধিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরানুভূতির অবস্থায় পরমানন্দ উপভোগ করিবে। এইভাবে অবিশ্রান্ত সাধনার ফলে তুমি অবশেষে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জয় করিতে সক্ষম হইবে এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমগ্র রাজ্য তোমার অধিকারে আসিবে। ধ্যানলব্ধ ঐশ্বরিক শক্তি লাভ করিয়া তুমি সমাধির অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উপনীত হইবে এবং তখন যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে সে আনন্দ সত্যই অসীম ও অবর্ণনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ব্রহ্মানুভূতি ॥

আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-কবি রালফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সন (Ralph Waldo Emerson) তাঁহার *Over Soul* বা 'পরমাত্মা' নামক প্রবন্ধে যথার্থই বলিয়াছেনঃ "মানুষ যেন কোন একটি মন্দিরের সম্মুখভাগ আর সেই মন্দিরের মধ্যে নিখিল জ্ঞান ও সর্ববিধ কল্যাণ বিরাজ করিতেছে। আমরা সাধারণত যাহাকে মনুষ্যবলি সেই পানাহারপরায়ণ, কৃষিকার্য-রত ও বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু সে তাহার মিথ্যা রূপকে প্রকাশ করে ও সেজন্য প্রবঞ্চিত হয়। এই সাধারণ মানবকে আমরা মিথ্যা রূপময় বলি, কিন্তু সত্যকার মানব যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার সমুদয় কার্য দ্বারা নিজের আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারিলে তাহার সম্মুখে আমাদের মস্তক অবনত হয়"। যে মানুষ আহার-নিদ্রা চাষ-আবাদ ও হিসাব-নিকাশ লইয়াই ব্যস্ত সে ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ। এই প্রকার আপাতপ্রতীয়মান (apparent) মানুষকে আমরা কৃত্রিম অথবা সাধারণ মানব বলি, কিন্তু মুক্ত মানব স্বরূপত সর্বজ্ঞ, দেবস্বভাব ও সদানন্দময়। মানবাত্মা অথবা জীবাত্মা যেন কোনও একটি বৃত্তের কেন্দ্র, এই বৃত্তের কেন্দ্র সর্বত্র আছে কিন্তু ইহার পরিধিকে

কোনস্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না[১] সে অসীম বৃত্তকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা বলে। এই পরমাত্মা অনন্ত জ্ঞান এবং সমুদয় বিদ্যা, সত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ললিত কলা, সৌন্দর্য ও প্রেমের অনাদি উৎসস্বরূপ। অনন্ত জ্ঞানের এই সীমাহীন বৃত্ত প্রত্যেক বাহ্য ও আপাতপ্রতীয়মান (apparent) মানবের প্রকৃত আধার বা অধিষ্ঠান। অসীমজ্ঞানের এই নির্ঝরিণী প্রত্যেক মানবের অন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত, কিন্তু তাহার সন্ধান জানে না বলিয়াই সেই সাধারণ মানব চতুর্দিকে জ্ঞানের অন্বেষণে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়। বিপুলস্রোতা ও স্বচ্ছসলিলা নদীর তীরে বাস করিয়াও পিপাসা দূর করিবার জন্য পানীয় জলের কূপ খনন করা যেমন নির্বুদ্ধিতা নিজের মধ্যে অসীম-জ্ঞানসিন্ধু সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া একবিন্দু জ্ঞানের জন্য মানুষ তেমনি এখানে সেখানে পাগলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

আমরা যে স্বরূপত জ্ঞানস্বরূপ ও সমস্ত সদ্‌গুণের আধার তাহা আমরা জানি না। প্রত্যেক জীবাত্মায় যে নিখিল জ্ঞান ও সদ্‌গুণরাশি বিরাজিত তাহা উপলব্ধি করাও বহু সাধনসাপেক্ষ। আমরা এখন বাহির হইতেই জ্ঞানান্বেষণ করিতেছি, কারণ ভ্রমবশত আমরা ভাবিতেছি যে বাহির হইতেই জ্ঞান আসিবে। প্রত্যেক জীবাত্মার পশ্চাতে শাশ্বত জ্ঞানের অবিশ্রান্ত ফল্গুধারা সর্বদা প্রবাহিত। এই অসীম জ্ঞানের প্রবাহকে যেন একটি দ্বার

১। "The soul in each individual is a centre of that circle whose circumference is nowhere, whose centre in everywhere"

অবরোধ করিয়া আছে। সেই আবরণেব দ্বার উন্মুক্ত করিবার উপায় যাঁহারা জানেন তাঁহারা অবতার, সিদ্ধপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানী মহামানবরূপে জগতে সুপরিচিত। সর্বজ্ঞ আত্মার ঐশ্বরিক শক্তিরাশি যখন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় তখন এই বাহ্য বা আপাতপ্রতীয়মান মনুষ্যকে ঐশ্বরিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত সত্যদ্রষ্টা পুরুষ বলা হয়। তখনই মানুষ তাহার দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করে এবং ইতর প্রাণীর ন্যায় অবনত জীবন যাপনে বিরত হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির চরমলক্ষ্য আত্মজ্ঞান অর্থাৎ সমাধির অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। এই সমাধি লাভ করিয়া তিনি যথার্থ ধার্মিক হন ও সর্বধর্মের একমাত্র চরমলক্ষ্যে উপনীত হইয়া থাকেন। জগতের সমস্ত ধর্মই যেন ইতর প্রাণীর স্তর হইতে ক্রমশ উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়া ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়া পরমসত্যকে উপলব্ধি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য মানব-মনের বিভিন্ন প্রকার প্রচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভই ভারতবর্ষে মানবের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও চরম লক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত। মানবাত্মা যখন এই ঈশ্বরের (পরমাত্মার) সাক্ষাৎকারলাভ করেন তখনই তাঁহার জীবনে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার বা ধর্মের আরম্ভ হয় এবং তাহার পূর্বে নয়। যিনি এই ব্রাহ্মীস্থিতির অবস্থা লাভ করিয়াছেন তিনি আর বাহিরে কোথাও কিছুই অন্বেষণ করেন না, তিনি দেখেন তাঁহার মধ্যেই

সমুদয় সত্য ও জ্ঞানরাশি নিহিত আছে। বহুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে হিন্দুগণের মধ্যে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভই ধনী, দরিদ্র, রাজা, ভিখারী, সাধু ও পাপী সকলের জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া আছে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই ভারতবর্ষে কত রাজা ও রাজপুত্র সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন এবং এক কথায় তাঁহাদের ঐশ্বর্য, নাম, সুখ, স্বাচ্ছান্দ্য ও বিলাসিতা প্রভৃতি সমুদয় প্রিয়তম বস্তুই তাঁহারা বিসর্জন দিয়াছেন। যে সদ্‌গুণরাজি সাধক চরিত্রের অলঙ্কার স্বরূপ, যাহা মানুষকে এই জীবনে দেবত্ব দান করে, সে সমস্তই এই ব্রহ্মজ্ঞান বা সমাধি লাভের চেষ্টার ফল। যিনি আপনার দিব্যস্বভাবকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার চরিত্রে প্রকাশিত হৃদয়ের অনুপম পবিত্রতা, শান্তভাব, শিশুসুলভ সরলতা, মহান আত্মত্যাগ এবং সর্বজীবে অহেতুক প্রেম ও করুণা অপেক্ষা আরও মহত্তর বা উচ্চতর এবং দিব্য ও অপার্থিব বলিয়া কোন সম্পদ প্রকাশিত হইতে কিছু বাকি থাকে কি? না, কিছুই থাকে না। এই সমস্ত মহামানবগণ আলোকস্তম্ভের ন্যায় আমাদের জীবনে অন্ধকার দুর্গম পথে সর্বদা পথনির্দেশক আলোকরশ্মি বিকীরণ করিয়া ব্রহ্মানুভূতি বা সমাধির চিরশান্তি ভূমিতে অগ্রসর হইবার জন্য আমাদিগকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারাই মানব জাতির মহানেতা, লক্ষ লক্ষ নরনারীর উপর তাঁহারা প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহারাই এ'জগতে ভগবানের জীবন্ত প্রতিমূর্তি এবং প্রকাশস্বরূপ। জগতের অধিকাংশ নরনারী তাঁহাদিগকে

ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজা করেন। তাঁহারাই নিজ জীবনে জগতের যাবতীয় ধর্মের চরম-আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষ মোহমুগ্ধ ও আত্মপ্রতারিত বলিয়া সেই পরমসত্যকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেজন্য সে অপূর্ণ ও সর্বতোভাবে সীমাবদ্ধ, তাহার আধ্যাত্মিক চরিত্র বিকশিত নয় এবং হীন স্বার্থদ্বারা সে সর্বদা অভিভূত থাকে। আমরা সকলেই জানি আমরা এক্ষণে অল্পাধিক পরিমাণে স্বার্থপর জীবন যাপন ও নানারূপ সঙ্কীর্ণতার বশে কার্য করিতেছি এবং আমরা যাহা হইতে ইচ্ছা করি তাহা এখনও হইতে পারি নাই। কিন্তু কখনও যদি আমরা জীবনের কোনও পুণ্যময় মুহূর্তে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনুভব করি আমাদের আত্মা স্বভাবত শ্যেনপক্ষীর ন্যায় মুক্ত, অনন্ত আকাশে অবাধে সে বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু বর্তমানে স্বার্থশৃঙ্খলিত ও স্থূলদেহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা হইলে ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের বন্ধনের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকি। অসীম আনন্দে অনন্ত আকাশের চারিদিকে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইবার আকাঙ্ক্ষায় আমরা তখন মোহশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে চেষ্টা করি এবং আমাদের বন্ধনপ্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমরা বদ্ধ তাহাদের জয় করিবার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করি। প্রকৃতি ও তাহার নিয়মসমূহের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য প্রত্যেক মানবের জন্ম। প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা আরোপিত সমস্ত সঙ্কীর্ণ

সীমা অথবা বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত প্রচেষ্টার উপাদানে যেন আমাদের জীবন গঠিত। প্রকৃতির শক্তিগুলি আত্মাকে একদিকে সবলে মোহিত ও আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে আর আভ্যন্তরিক সদ্‌বৃত্তিগুলি আবার তাহাদিগকে দমন ও বশীভূত করিবার জন্য আমাদিগকে উদ্‌বুদ্ধ করে। আত্মা কখনও ক্রীতদাসের ন্যায় প্রকৃতির আজ্ঞাবহ হইতে চাহে না, আত্মা প্রকৃতিকে জয় করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াস করে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই প্রাণপণ সংগ্রামই মানবজাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র কারণ। যে ব্যক্তি প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের উপর আধিপত্য করিতে জানে না, বরং অন্ধভাবে তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলে, সে অসভ্য, বন্য ও ইতর জন্তুদিগের ন্যায়। প্রকৃত সভ্যতার অর্থ মানবাত্মার দ্বারা প্রকৃতিকে জয় করা এবং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয়। বাহ্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই প্রকৃতি আমাদিগকে যেন আদেশ করেঃ "তোমরা আমার নিয়ম ও নির্দেশ পালন কর", কিন্তু আমরা বলিঃ "না, কিসের জন্য তোমার অধীন হইব? বরং তুমিই আমাদের আদেশ পালন করিবে"। জড়প্রকৃতি আমাদিগকে ইতর জন্তুদিগের ন্যায় বিচরণ করিতে এবং অনাচ্ছাদিত পর্ব্বত গুহা ও অরণ্যের মধ্যে বাস করিতে ইঙ্গিত করে। কিন্তু আমরা বলিঃ "না, আমাদের

উপযুক্ত বসন ও উপযুক্ত বাসস্থান আবশ্যক"। আমরা চাই বলিয়া সেইসকল লাভ করি। প্রকৃতি আমাদের সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলিকে ধ্বংস করিতে চায়। শীতাতপ এবং ঋতু-পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃতি আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব করিতে চায়, কিন্তু সে সমস্ত অসুবিধা হইতে আমরা আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করি এবং কৃতকার্য হই। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কিরূপে আমরা জয়ী হই! প্রকৃতি ও তাহার নিয়মাবলীর অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণ এবং যাহাতে সে আমাদের আজ্ঞাধীন হয় এরূপভাবে তাহার শক্তিগুলিকে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া আমরা প্রকৃতিকে জয় করি। বিদ্যুৎ, বাষ্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলি কিরূপ প্রচণ্ড ও প্রবল তাহা আমরা জানি, কিন্তু সেই সকল বিরাট শক্তিকে আমরা ব্যবহার করি ও ভৃত্যের ন্যায় কার্য করাইয়া লই। উন্নত প্রকৃতির ও ঐশ্বরিক সমস্ত শক্তিই মানবাত্মায় নিহিত আছে বলিয়া জড়প্রকৃতির উপর মানবের এই আধিপত্য লাভ করা সম্ভবপর হইয়াছে। যে সকল শক্তি প্রকৃতিকে জয় করে, তাহারা মানবের বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিজয়ীশক্তি বিজিতশক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই জড়প্রকৃতি মানবের বুদ্ধি ও ইচ্ছা-শক্তি অপেক্ষা দুর্বল।

এইরূপে আমরা অন্তঃপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই সে স্থানেও উচ্চ ও নীচ বৃত্তিযুক্ত মনে, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর বুদ্ধিতে, উচ্চতর ও নিম্নতর ইচ্ছাশক্তিতে এবং আধ্যাত্মিক,

বাস্তব বা দিব্যমানব ও আপাত সাধারণ বা পশুমানবের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চলিতেছে। দাস যেরূপ প্রভুর আজ্ঞাবহ সেরূপ যাহা দেহের ভৌতিক ও ঐন্দ্রিয়িক কুপ্রভাবের বশবর্তী হয় তাহাকেই নিম্নতর মন, নিম্নতর বুদ্ধি, নিম্নতর ইচ্ছা ও পশুমানব বলে; আর তাহাকেই উচ্চতর মন, উচ্চতর বুদ্ধি ও উচ্চতর ইচ্ছা এবং মানবের আধ্যাত্মিকতা, বাস্তবতা বা দেবত্ব বলে যাহা সমস্ত নীচ ও হীন প্রকৃতিকে দমন ও জয় করিতে পারে এবং তাহার উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করে। ইতর প্রাণীদিগের জীবনে কিংবা তাহাদের ন্যায় হীন ও অবনত মানবদের মধ্যে অবশ্য এই নৈতিক সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে আমরা আর পশু-ভাবাপন্ন থাকি না, তখন আমরা মনুষ্যগুণসম্পন্ন বা নীতি-পরায়ণ হই। কিন্তু কেবল মনুষ্যভাবাপন্ন বা নীতিপরায়ণ হওয়াই পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ নহে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের মধ্যেও পার্থক্য আছে। নৈতিক স্তর পশুস্তর ও আধ্যাত্মিক স্তরের একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। নৈতিক মানবের মনে আংশিক পশুপ্রকৃতি ও আংশিক দেবপ্রকৃতির অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। নীতিপরায়ণ ব্যক্তি তাহার অন্তরের পশুত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহা দমন করিতে পারে এবং মনের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া নীচ বা পশুপ্রকৃতিকে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তারে বাধা দিবার বিশেষ চেষ্টা করে। নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে প্রলোভন হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে

হইবে, কারণ তখনও সে প্রলোভন জয় করিবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয় নাই। প্রলোভনের অতীত উন্নত স্তরে উঠিবার জন্য তাহার সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। যখন পশুপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা যায় এবং নৈতিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি যথার্থ আধ্যাত্মিক বা দিব্যস্বভাবসম্পন্ন হয় তখনই কেবল এই সংগ্রাম ও সাধনপ্রচেষ্টার অবসান হয়। সেই দিব্যাবস্থা লাভ হইলে আর প্রলোভনের আশঙ্কা থাকে না। যতদিন মানুষ তাহার পশুস্বভাবের সহিত সংগ্রাম করে ততদিন সে নৈতিক স্তরেই থাকে, কিন্তু যখন সে উহাকে সম্পূর্ণরূপে জয় করে তখনই সে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। নৈতিক স্তরের লোক পশু-ভাবের প্রলোভনে আকৃষ্ট ও অভিভূত হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ আধ্যাত্মিক প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রলোভনের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত, কেননা যে সকল নীচ আসক্তি ও পশুপ্রবৃত্তি নৈতিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে চেষ্টা করে, তিনি তাহাদের প্রভাবের বাহিরে।

সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি লইয়া সমস্ত সংগ্রাম যথার্থ আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবের জীবনে চিরদিনের জন্য শেষ হয়। তখন প্রকৃত চৈতন্য বা মানবের দিব্যস্বরূপ স্বমহিমায় বিরাজ করে এবং অপূর্ণতা ও স্বার্থপরতার মেঘরাশির ঊর্ধে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের ন্যায় তাহা দীপ্তি পায়। উচ্চতর দিব্যশক্তির মূর্তি দেব-দূতগণ, দেবতারা ও এমন কি সমগ্র জগৎ, প্রকৃতিবিজয়কারী এই সমস্ত অধীশ্বরের সম্মুখে অবনত হয়। বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্ট

এই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাতীত বা দিব্যস্বরূপতার অবস্থা লাভ করিয়াই রাজকুমার গৌতম বা শাক্যমুনি "বুদ্ধত্ব" এবং ন্যাজরেথবাসী যীশু "খৃষ্টত্ব" লাভ করিয়াছিলেন। যাহার এই অনুভূতি লাভ হয় তিনি পূর্ণতা লাভ করেন এবং স্বার্থ-পরতা ও সবপ্রকার অপূর্ণতা হইতেও তিনি মুক্ত হন। কেবল-মাত্র মানবই দিব্যজ্ঞানের এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইতে সক্ষম। ইতরপ্রাণী ও তাহাদের ন্যায় নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণকে প্রথমে মানবীয় বা নৈতিক স্তরে উন্নীত হইতে হইবে, কেননা এই অবস্থায় উন্নীত হইবার পূর্বে তাহারা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা পর্য্যন্তও করিতে পারে না। পশুস্বভাব ব্যক্তি ক্রমিক অভি-ব্যক্তির নিয়মে যখন নৈতিক বা মানবীয় স্তরে উন্নীত হয় তখন তাহার উক্ত অবস্থা লাভ করিবার শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং তখন হইতে সে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। আধ্যাত্মিকতার সেই চরম-অবস্থায় উপনীত হইলে তবে মানুষ তাহার আপন দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি কবিয়া থাকে। ইহাই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং'-এর (জীবাত্মার) আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠারূপ অখণ্ড আনন্দ ও পূর্ণত্বের অবস্থা।

সমাধি বা দিব্যজ্ঞানের অবস্থা অপেক্ষা কোন উচ্চতর অবস্থা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, কারণ এই অবস্থায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা এক হইয়া যায় এবং উপলব্ধি করে প্রেম, জ্ঞান ও চৈতন্যের অনন্ত উৎসের সহিত সে অভিন্ন। এই সময়ে জীবাত্মা বা "অহং" পরামাত্মা বা পরমপিতার সহিত

(Father in Heaven) একাত্মতা লাভ করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই মিলন বা একত্বের অবস্থা অপেক্ষা কোন উচ্চতর অবস্থা আপনারা কল্পনা করিতে পারেন কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে দিব্যজ্ঞান লাভের পূর্বে আপাত প্রতীয়মান 'অহং' অর্থাৎ জীবাত্মা তিনটি প্রধান অবস্থা অতিক্রম করে। প্রথম, পশুস্বভাব; এবং নৈতিক প্রকৃতির দ্বারা ইহাকে দমন করিতে হয়; দ্বিতীয়, নৈতিক প্রকৃতি এবং তৃতীয় ঐ নৈতিক প্রকৃতিই বিকশিত হইয়া আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হয়। মানুষ যখন পশুস্তরে অবস্থান করে তখন সে অত্যন্ত স্বার্থপর, বাসনাবদ্ধ এবং সংযমহীন হয়; সে ইন্দ্রিয়সুখের ও রিপুগণের দাসের ন্যায় থাকে। তখন তাহার পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা বা জীবনের কোনরূপ নৈতিক আদর্শের বোধ থাকে না, দৈহিক সুখই তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়; আধ্যাত্মিক বিষয়মাত্রকেই সে ঘৃণা করে এবং মনে করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ ও সে বিষয়ে আলাপ করাও নিজের সময় ও শক্তির বৃথা অপব্যয় মাত্র। কিন্তু সেই মানুষই আবার যখন অন্তরের মহৎ প্রেরণায় কিংবা সাধনসিদ্ধ সদ্‌গুরুর কৃপায় অবিদ্যা অন্ধকার হইতে মুক্ত ও মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হয় তখন সে নৈতিক জীবনযাপনের জন্য আবার প্রয়াস করিতে আরম্ভ করে এবং ইহাই তাহার ধর্মবোধের সূচনা অথবা আধ্যাত্মিক জাগরণের অবস্থা। এই অবস্থাই ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য সাধনের প্রথমাবস্থা। তাহার পরে সে নৈতিক ও পুণ্য জীবনযাপন করিতে চেষ্টা ও নিজের স্বভাবকে

পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করে এবং স্বীয় দোষ ও দুর্বলতার সন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন করিতে যত্নবান হয়। ইহাই চিত্তশুদ্ধির অবস্থা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তর। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় "সাধক"-এর অবস্থা বলা হয়। নূতন প্রবর্তিত সাধকের নিজ স্বভাব জয়, রিপুদমন এবং অভ্যাসগুলিকে সংযত করিয়া পশুপ্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিবার জন্য প্রাণপণে সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। সাধনার এই সমস্ত উপায় না জানা থাকিলে তাহা শিখিবার জন্য যিনি সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপতার অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন এইরূপ কোন সিদ্ধ মহাযোগীর উপদেশ অনুসরণ তাহার করা উচিত। দৈনন্দিন জীবনে এই আদর্শ বিস্মৃত হইলে চলিবে না; প্রলোভনের বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে। তাহাকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ না হইলে কেহ কখনও চরম ও পরম সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না। অসত্যের দ্বারা সত্য লাভ হয় না; সত্যের দ্বারাই সত্যকে লাভ করিতে হইবে। যদি আমরা সত্যসন্ধ না হই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পূর্বোক্ত অবস্থা লাভ করিতে আমরা এখনও প্রস্তুত নই। অতএব প্রতি বাক্যে ও কার্যে সাধকের সত্যপরায়ণ হইতে চেষ্টা করা উচিত, কারণ যে পরিমাণে সে এই বিষয়ে অকৃতকার্য হইবে ঠিক সেই পরিমাণে তাহার শাশ্বত সত্যলাভের প্রয়াসও ব্যর্থ হইবে।

চিত্তশুদ্ধি লাভ ও পশু প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য চারিটি

গুণ একান্ত আবশ্যক। প্রথম আত্মসংযম অর্থাৎ ধারণা বা একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয়দমন ও মনঃসংযম; দ্বিতীয় সত্যনিষ্ঠা; তৃতীয়, সর্বজীবে নিঃস্বার্থপ্রেম ও চতুর্থ নিষ্কামকর্ম। উপনিষদে দেখা যায় যে ব্যক্তি দুর্নীতি হইতে বিরত হয় নাই ইন্দ্রিয়গণকে দমন করে নাই, ধারণার অভ্যাস দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া সত্যনিষ্ঠ হয় নাই এবং যে সকলের প্রতি দয়ালু নয় সে ব্যক্তি কখনও আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। জগতের সকল নীতিবিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্রের[১] তত্ত্ব মাত্র এই কয়েকটি কথাতে নিহিত। তাহা ছাড়া এই চারিটি দুর্লভ গুণের অভ্যাসেই আধ্যাত্মিক উন্নতির যাবতীয় উন্নতির রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাসী হই অথবা না হই কোন অবতার পুরুষে আমাদের বিশ্বাস থাকুক অথবা না থাকুক, যদি আমাদের আত্মসংযম, চিত্তের একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও সর্বজীবে নিঃস্বার্থ প্রেম থাকে তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতেছি বুঝিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি ঈশ্বরে বা কোন ধর্মমতবিশেষে বিশ্বাসী হয় অথচ এই সাধনচতুষ্টয়ের অর্থাৎ ঐ চারিটি গুণসম্পদের অধিকারী না হয় তাহা হইলে একজন সাধারণ সংসারী মানুষ অপেক্ষা সে আর অধিক ধর্মভাবাপন্ন নহে। বাস্তবিক তাহার বিশ্বাস কেবলমাত্র

১। নাবিরতো দুশ্চরিতাশাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈম মাপ্নুয়াৎ॥

—কঠোপনিষৎ ২।২৪

মৌখিক ব্যাপার। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে ব্যক্তিতে এই সকল গুণের বিকাশ হইয়াছে সেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের সময় সুপ্তভাবে আত্মায় অবস্থিত আত্মসংযমরূপে চিত্তের একাগ্রতাশক্তি প্রভৃতি অন্তর হইতে বিকশিত হইতে আরম্ভ করে এবং ঐ শক্তিগুলি মানবের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কার্যের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে।

এই সংসার যেন একটি বিরাট শিক্ষালয়, সমস্ত মানুষ যেন ইহার শিক্ষার্থী এবং মানবের আধ্যাত্মিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলি যেন ইহার বিভিন্ন শ্রেণী। এক শ্রেণীর পাঠ শেষ হইলে জীবাত্মা উচ্চতর এক শ্রেণীর শিক্ষা আরম্ভ করে। যদি সে পুনঃপুনঃ একই পাঠ অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাতে বাধা দিবার কিছু নাই। সে একই শ্রেণীতে বহু বৎসর—এমন কি বাসনার পরিবর্তন না হওয়ায় বহুজন্ম পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে বারংবার একই পাঠ অধ্যয়ন করিতে সে বিরক্ত হয় এবং তাহাতে আর আনন্দ পায় না সেই মুহূর্তেই সে স্বভাবতঃই উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে চেষ্টা করে ও নূতন পাঠ গ্রহণ করে। সুতরাং যতদিন কোন একটি পাঠ আমাদিগকে আকৃষ্ট ও তন্ময় করিয়া রাখে ততদিন উহা আমাদিগকে তৃপ্তিদান করে এবং আমরা আর উচ্চতর পাঠ্যবিষয়ের আবশ্যকতা অনুভব করি না, কিন্তু এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসিবে যখন বর্তমান পাঠগুলি

মাধুর্য হারাইয়া নীরস, বিস্বাদ ও একঘেয়ে বোধ হইবে এবং তখনই আমরা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর চিত্তাকর্ষক পাঠ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিব। জীবাত্মা বর্তমান যাহা-কিছুর অধিকারী তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেষ্ঠতর বস্তুর জন্য অনুসন্ধান তাহার ক্রমিক আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির কারণ। অধিকাংশ মানব ইন্দ্রিয়সুখকর বিষয়ে এমনই অভিভূত যে, কোন উচ্চতর আদর্শের চিন্তা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহারা আপনাদিগকে এরূপ অসহায় করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহাদের মানসিক অবস্থা ক্রীতদাসের ন্যায় অবনত হইলেও ইহা তাহারা অনুভব করিতে অক্ষম।[১] সেজন্য ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: "সহস্র সহস্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে দুই একজন মাত্র মুক্তির অন্বেষণ করে, অপর সকলে দাসত্বেই আনন্দ পায়। আবার এইরূপ সহস্র সহস্র মুক্তি অন্বেষণকারী-দিগের মধ্যে দুই একজন মাত্র আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা ও নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য অধ্যবসায়ের সহিত সাধনা ও চেষ্টা করিয়া থাকে।[২] জোর জবরদস্তি করিয়া ঔষধের বড়ি খাওয়াইয়া দেওয়ার ন্যায় কেহ কাহাকেও কোনও দিন জোর করিয়া ধর্মভাবাপন্ন করিতে পারে না।

আপাতদৃশ্যমান (apparent) ও সাধারণ মানবের অন্তঃপ্রকৃতির

১। ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥—গীতা ২।৪৪

২। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥—গীতা ৭।৩

ক্রমিক বিকাশের দ্বারা তাহার আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা সংসাধিত হয়। প্রত্যেক মানব মনে আপনা হইতে অকস্মাৎ একদিন আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা অবশ্যই উদিত হইবে। সেই ইচ্ছা বলবতী হইলে মানবকে অনাত্মা হইতে আত্মাকে, অনিত্য হইতে নিত্যকে, অসত্য হইতে সত্যকে বিচার করিবার প্রেরণা দান করিবে। এই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক আত্মবিকাশের তৃতীয় অবস্থা। যথার্থ বিচার ও বিবেক হইতে পার্থিব সুখভোগ এবং স্বর্গাদি সুখে ইহামূত্রফলভোগবিরাগ অর্থাৎ জড় ও অনিত্য বস্তুতে অনাসক্তি বা বৈরাগ্য সাধনার চতুর্থ অবস্থা। এই সদসদ্বিচারশীল অবস্থায় মানবের পক্ষে ধন সম্পদ এবং ইন্দ্রিয়সুখের বিন্দুমাত্রও মোহ ও আকর্ষণ থাকে না, তখন তাহার জীবনের সমগ্র লক্ষ্যই আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায়। নিখিল ভুবন কাঁপিয়া উঠিলে বা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও এই অবস্থা হইতে সে আদৌ বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভের পর সাধক আত্মজ্ঞানরূপ পঞ্চম অবস্থায় উপনীত হন। আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সময় সাধককে অনেকগুলি মধ্যবর্তী অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। সাধক তখন নিজের মধ্যে বহু অলৌকিক শক্তি অনুভব করেন এবং নানারূপ বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক বস্তুর সম্মুখীন হন। সাধক তাঁহার মনকে যদি ঐরূপ কোন শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইতে দেন তাহা হইলে সেই স্থানেই তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অপরের মনোভাব বলিয়া দেওয়া, দূরবর্তী ঘটনাসমূহ অবগত

হওয়া, ভবিষ্যৎ বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া ও ব্যাধির আরোগ্য করা প্রভৃতি যে সকল যোগজশক্তি প্রতিটি মানবের অন্তরে সুপ্ত আছে তাহারা সাধককে প্রলোভন দেখাইয়া অধঃপাতিত করে। সাধারণ ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণী শক্তিই যখন এইরূপ প্রবল তখন উন্নত মানসিক শক্তিলাভের ফলে সূক্ষ্ম-প্রলোভনসমূহের আকর্ষণ আরও কত ভীষণ! যাহা হউক, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিকে যেমন করিয়া হউক ঐ সকল প্রলোভন জয় করিতে হইবে, নতুবা তাহার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। তাঁহাকে নিম্নলিখিত সাধু ও কাঠুরিয়ার উপাখ্যানটি স্মরণ রাখিতে হইবে এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ যে চরম-আদর্শ তাহার সম্মুখে রহিয়াছে তাহা ছাড়া অন্য-কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেই দিকেই তাহাকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইবে।

উপাখ্যানটি হইল এই ঃ ভারতবর্ষে এক গভীর অরণ্যের প্রান্ত-ভাগে কোন একটি গ্রামে একজন দরিদ্র কাঠুরিয়া বাস করিত। অরণ্যে সংগৃহীত কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া তাহাকে জীবিকা অর্জন ও সংসার প্রতিপালন করিতে হইত। সে সমস্তদিন বৃক্ষশাখা ছেদন করিত ও তাহা শুষ্ক করিয়া আঁটি বাঁধিত এবং দিবা-অবসানে তাহা হাটে লইয়া দুই-চারি আনায় বিক্রয় করিত। সেই সামান্য অর্থের উপরই তাহার সমগ্র পরিবারের প্রতিদিনের ভরণপোষণ নির্ভর করিত। এইভাবে তাহার কয়েক বৎসর অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল। একদিন প্রকাণ্ড এক কাষ্ঠের

বোঝা লইয়া অবসন্ন দেহে সেই অরণ্য হইতে বাহির হইবার সময়ে দয়াভদ্রচিত্ত এক সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সাধু তাহার দুরবস্থা দেখিয়া বলিলেন: 'ওহে বাপু, আরও গভীর বনে অগ্রসর হওনা কেন?' দরিদ্র কাঠুরিয়া উত্তর করিল: 'কেন মহাশয়, এখানেই আমি যথেষ্ট কাঠ পাইতেছি, সুতরাং আর বেশী দূরে অগ্রসর হইয়া কি ফল অধিক হবে?' কাঠুরিয়ার এই কথা শুনিয়া সাধু পুনরায় তাহাকে অরণ্যের মধ্যে আরও অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর তাঁহার বাক্যগুলি কাঠুরিয়ার মনে এক গভীর রেখাপাত করিল। অরণ্যের যেই স্থানে সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই স্থানে পরদিন উপস্থিত হইলে মহাপুরুষের উপদেশ তাহার স্মরণ হইল এবং সে তাহা একবার পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া অরণ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিল। যখন সে অরণ্যের বনলতা ভেদ করিয়া গভীরে অগ্রসর হইতেছিল ও মনে মনে সাধুর উপদেশের অর্থ কি তাহা চিন্তা করিতেছিল তখন সে হঠাৎ চন্দনের মধুর সুবাস আঘ্রাণ করিল ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া নিকটেই বহু চন্দনবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তখন তাহার আনন্দের সীমা রহিল না! সে সাধুর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ দিল ও যথাসাধ্য চন্দনকাষ্ঠ আহরণ করিয়া বাজারে লইয়া গিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিল। পূর্বের ন্যায় কার্য করিতে থাকিলেও সে পাঁচ বৎসরে যাহা পাইত তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ করিল। পরদিন পুনরায় সে অরণ্যে গমন করিল ও সাধুর উপদেশ স্মরণ

করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—'সন্ন্যাসী আমাকে চন্দনকাষ্ঠের কথা কিছুই বলেন নাই, তিনি কেবল 'অগ্রসর হইয়া পড়' কথাই বলিয়াছেন।' এইরূপ ভাবিয়া সে যেই স্থানে চন্দনকাষ্ঠ পাইয়াছিল সেই স্থান অতিক্রম করিয়া আরও অধিক দূরে জঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর হইল। অবশেষে সে একটি তাম্রখনি দেখিতে পাইল। তখন সে যতদূর সম্ভব তাম্র সংগ্রহ করিল ও বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করিল। পরদিন পুনরায় সাধুর উপদেশ অনুসারে তাম্রখনির নিকট না থামিয়া আরও গভীরতর জঙ্গলে অগ্রসর হইল এবং একটি রৌপ্যের খনি দেখিতে পাইল। সেই দিন সে খনি হইতে প্রচুর রৌপ্য সংগ্রহ করিল ও সেই সংগৃহীত রৌপ্য বিক্রয় করিয়া সে প্রচুর অর্থ লাভ করিল। কিন্তু সাধুর সেই অগ্রসর হইবার উপদেশ সে বিস্মৃত হয় নাই। দিনের পর দিন সে ক্রমশঃ বনের মধ্যে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। পথের মধ্যে যে সকল অদ্ভুত বস্তু আবিষ্কার করিতে লাগিল তাহাতে সে বিচলিত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না। অবশেষে একদিন সে একটি স্বর্ণখনি অতিক্রম করিয়া হীরক ও নানাবিধ মূল্যবান মণিরত্নের খনিতে আসিয়া উপনীত হইল। সাধু যে তাহাকে ঐ স্থানেই উপস্থিত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত বুঝিয়া সে আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না এবং সেই মণিরত্নাদি লইয়া দেশের মধ্যে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইল।

যাঁহারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা করেন

তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ এক উপদেশ। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরও প্রতি মহাপুরুষগণের ঐ উপদেশ—"অগ্রসর হও"। সামান্য উন্নতির পথে দুই চারিটি সিদ্ধাই, বিভূতি বা শক্তি লাভ করিয়া সাধনের প্রচেষ্টা হইতে তাঁহারা সাধককে বিরত হইতে বলেন। নাম-যশের কামনা ও নানাপ্রকার দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রতারিত হইয়া অনেকে এই সকল সিদ্ধাইকে আধ্যাত্মিক সম্পদ বলিয়া ভ্রম করে এবং ভাবে যে, তাহারা যখন মানসিক শক্তির বলে অপর লোকের ব্যাধি প্রভৃতি আরোগ্য করিতে পারে তখন তাহারা নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়াছে। আমেরিকায় এই প্রকার আত্মপ্রতারিত অলৌকিক শক্তি-ব্যবসায়ীদিগের (miracle-mongers) সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়াছি। যদি কাহারও অন্তরে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ ও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের বাসনা থাকে তবে সে যেন ঐ সকল বিভূতির প্রলোভন হইতে সাবধান থাকে। ঐ সকল শক্তির একটিও সত্যকার আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ নহে। অতএব আধ্যাত্মিক তত্ত্বসাক্ষাৎকারে অভিলাষী ব্যক্তিকে একান্তযত্নের সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ঐ সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে হইবে। যাহারা এই সকল সিদ্ধাই বা শক্তিতে আসক্ত হয় তাহাদের যতদিন সেই আসক্তি থাকে ততদিন তাহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। সিদ্ধাইগুলি মানুষকে মানসিক স্তরে (mental plane) আবদ্ধ রাখে ও তাহাকে

এভাবে মোহমুগ্ধ করে যে, সে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভূমিতে আরোহণ করিবার চেষ্টা পর্যন্তও বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হয়।

হিন্দুযোগীরা এই বিভূতিরূপ শক্তিগুলিকে নিম্নস্তরের প্রলোভন অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী সূক্ষ্মতর প্রলোভন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা যত্নপূর্বক ত্যাগ করা উচিত। উহারা যদি আপনি আসে আসুক, কিন্তু উহাদিগকে পাইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়। উহারা আমাদের উন্নতির নিদর্শনমাত্র (sign-posts), কিন্তু সাধনার লক্ষ্য বা সর্বোচ্চ বস্তু নহে। উহাদের নিজেদের কোনই মূল্য নাই সেইজন্য উহাদিগকে শুধু সত্য-উপলব্ধির প্রতিবন্ধকরূপে জানিয়া সর্বদা পরিত্যাগ করা শ্রেয়। ধর্মসাধনার প্রকৃত লক্ষ্য বিস্মৃত না হইয়া যে সকল সাধক ঈশ্বরসাক্ষাৎকারকে ইজীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ ও আদর্শ বলিয়া জানেন এবং সেই উদ্দেশ্যকে সর্বদা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া অবিচলিত চিত্তে অগ্রসর হন, ঐ সকল বিভূতি বা যোগশক্তি তাঁহার আর কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। যথার্থ সাধক সমাধিতে ব্রহ্মানুভূতির অভিলাষী, তাই তাঁহারা সর্বপ্রকার অলৌকিক শক্তির প্রলোভনকে জয় করিয়া অধ্যাত্মবিকাশের পঞ্চমস্তরে উপনীত হন। ক্রমশ তাঁহাদের দিব্যচক্ষু উন্মুক্ত হয় ও পরমতত্ত্বের আভাস পাইতে থাকেন। এই অবস্থায় উন্নত সাধক উপলব্ধি করেন আত্মা দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সূক্ষ্মশরীর কি তাহাও তিনি এই সময়ে

হৃদয়ঙ্গম করেন। আত্মা পুনরায় শরীর ধারণ করে কিনা, এই জন্মের পূর্বেও আত্মার অস্তিত্ব ছিল কিনা—ইত্যাদি বিচিত্র প্রশ্নের তখন সমাধান হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় দিব্যজ্ঞান লাভ হয় এবং সিদ্ধ অবস্থার ফলে সাধক দৈহিক ও মানসিক সকল জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন। ঈশ্বরের সহিত আত্মার প্রকৃত সম্বন্ধও তখন তিনি উপলব্ধি করেন। এই ঈশ্বরানুভূতি বা দিব্যজ্ঞানলাভের পর মানুষ আধ্যাত্মিক বিকাশের আরও উন্নত ভূমিতে আরোহণ করেন। ইহা ষষ্ঠ পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার আলোকপ্রকাশের বা অধ্যাত্ম-জ্ঞানের চরমভূমি। এই সময়ে সাধক আপন অভিপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হন এবং এই জন্মেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া শাশ্বত আনন্দের অধিকারী হন। বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন যোগী ও দার্শনিকগণ এই অবস্থাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম 'সমাধি'। বৌদ্ধগণ ইহাকে 'নির্বাণ' বলিয়া থাকেন। নির্বাণের অর্থ দুঃখ-কষ্ট, স্বার্থপরতা ও সর্বপ্রকার অপূর্ণতার অবসান এবং পরমানন্দ লাভ। কেহ কেহ ইহাকে অনস্তিত্ব বা শূন্যতার অবস্থা (nothingness) বলিয়াও মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাধি অর্থে শূন্যতাকে নির্দেশ

১। শূন্যতা মাধ্যমিক বৌদ্ধদের চরমসিদ্ধান্তের পরিণতি; এই শূন্যতা void অথবা 'nothingness' নয়, কিন্তু 'suchness' বা 'thatness'-এর, অর্থাৎ কোন-কিছু সত্তার নামান্তর। আচার্য শঙ্কর এই বলিয়া ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ্‌ভাষ্যেও শূন্যতা খণ্ডন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শূন্যতা যে সাধনার চরমপরিণতি ইহা কে বলিল এবং কেই বা ইহা অনুভব করিল? অবশ্যই তাহা হইলে এই শূন্যের একজন বক্তা ও অনুভবকর্তা আছেন যিনি বলেন সত্য বা শূন্য'? তাহা হইলে এখন বলিতে হয়, এই

করে না। ইহা আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভের অবস্থা। মধ্যযুগের ধ্যানী ও মরমী খৃষ্টান সাধকরা (mystic) ইহাকে দিব্য-ভাবাবেশ (ecstasy) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও আধুনিক খৃষ্টানগণ ইহাকে ঈশ্বরসাযুজ্য (Divine communion) বলেন। নাম অবশ্য বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অবস্থাটি সর্বক্ষেত্রেই এক দেখা যায়। এই অবস্থা বিশ্বের সকল ধর্মের চক্ষে এক ও সমান। খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের সত্যান্বেষী সাধকরা স্থূলইন্দ্রিয়রাজ্যের পরপারে অতিসূক্ষ্ম পরমচৈতন্যের উপলব্ধির জন্য কঠোর সাধনা করেন। এই অতীন্দ্রিয় অবস্থায় সমাধি লাভ করিয়াই যীশু 'খৃষ্ট' হইয়াছিলেন এবং শাক্যমুনি 'বুদ্ধত্ব' লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবির্ভূত হইয়া এই আত্মোপলব্ধির পরম-অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। শত-সহস্র লোক বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। তাহার পর সকল মহাপুরুষ ও লোকগুরুই সমাধিকে ধর্মসাধনার সর্বোচ্চ সিদ্ধির অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই অবস্থায় সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায় মানব ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় ও তাহার সেই ব্যাকুলতার গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারে না।

প্রতিটি জীবাত্মা অবিশ্রান্তভাবে তাহার ব্রহ্মস্বরূপতা বা

শূন্যের বক্তা ও অনুবকর্তা অবশ্যই শূন্য হইতে পৃথক এবং তিনি পরমচৈতন্যের স্বরূপ ব্রহ্মসত্ত্বা। সুতরাং পরমসত্য 'nothinguess' বা void কোনটাই নন; তাঁহার সত্তা অবশ্যই আছে এবং সেজন্য তাহা শূণ্যেরও বোদ্ধা বা জ্ঞাতা আত্মার স্বরূপ।

প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। অনুভূতির এই ষষ্ঠ ভূমিতে উপনীত হইলেই তাহার সাধনপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হয়। এই অনুভূতি লাভ হইলে জীবন ও মৃত্যুর সকল সমস্যার সমাধান হয়। এই অবস্থায় মনের সকল সংশয়ের চির-অবসান ঘটে ও সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়।[২] এই অবস্থায় লোকে সমগ্র পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতে অনুস্যূত অথবা পরিব্যাপ্ত পরমসত্তার সহিত একত্ব উপলব্ধি করে ও তখন জীবাত্মা নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ ও প্রকৃতির মায়িক প্রভাব হইতে মুক্ত হয়। এইরূপে সাধক সেই অতীন্দ্রিয় অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া[৩] যখন সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবতরণ করেন তখন দেখা যায়, তাঁহার সমগ্র স্বভাব বা প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিটি কার্যে তখন তাঁহার দিব্যভাব পরিস্ফুট হয় এবং তিনি চন্দ্র, সূর্য, তারকায়, নিজের আত্মায় ও বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে ও বস্তুতে সেই এক দিব্যসত্তা দর্শন করেন। এই দিব্যজ্ঞানের ফলে বিশ্বসম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয়। তখন তিনি দিব্যনেত্রে যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই ব্রহ্মসত্তার স্ফুরণ ও বিকাশ দেখিতে পান।

বিশ্বচরাচর সেই অসীম দিব্যসত্তায় অধিষ্ঠিত। ভারতবর্ষ ও অন্যান্যদেশের বহু দার্শনিক এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন।

২। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥—মুণ্ডকোপনিষৎ

৩। 'ব্যুত্থান' অনেকটা অর্থবাদের ন্যায়। ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে উত্থান বা ব্যুত্থান বলিযা কোন কথাই প্রকৃতপক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

যীশুখৃষ্টের দুই শতাব্দী পরবর্তীকালে নবপ্লেটোপন্থী (Neo-Platonist) প্লটাইনাস (Plotinus) তাঁহার জীবনে চারিবার এই দিব্যাঅনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। সমাধির নামে কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, ইহাতে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিসত্ত্বা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু সমাধির অবস্থায় আমরা কখনই আমাদের ব্যক্তিত্ব হারাই না। এই অবস্থা লাভ করিয়া প্লটাইনাস তাঁহার বন্ধু ফ্ল্যাকাসকে (Flaccus) বলিয়াছিলেন ঃ "ইহাতে আমাদের অন্তরে এক গভীর-উপলব্ধি হয়। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, কিরূপে ভগবানকে জানা যায় ? আমি বলি, যুক্তি বা বিচার দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। কেননা যুক্তির কার্য কোন এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক করিয়া দেখানো ও সেই বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানের আলোকপাত করা। সুতরাং আত্মা কখনও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। তুমি কেবল বিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বৃত্তি লাভ করিয়া তুমি আর সান্ত ও 'অহং'-সত্তা-বিশিষ্ট না থাকিয়া দিব্যপ্রকৃতির অধিকারী হও সেই অবস্থায় প্রবেশ করিয়া অনন্তের স্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি করিতে পার। ইহাই অতীন্দ্রিয় ভাবের অবস্থা (ecstasy)। এই অবস্থায় সমস্ত জাগতিক অশান্তি ও উদ্বেগের ভাব হইতে মন মুক্ত হয়। সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট বস্তুই সমানধর্মী বিষয়কে কেবল উপলব্ধি করিতে পারে ; অর্থাৎ কোন বিষয়কে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে তাহার ন্যায় সমগুণ-

বিশিষ্ট হইতে হইবে। এই অবস্থায় তুমি সকল সীমার অতীত হও বলিয়াই ভূমা অর্থাৎ অখণ্ডের সহিত তোমার একত্ব উপলব্ধি কবিতে পার। আপন স্বরূপে ও দিব্যপ্রকৃতিতে আত্মাকে একীভূত করিলে তুমি সেই মিলন বা একত্ব উপলব্ধি করতে পার।" পরফাইরিয়াস্ (Porphyrius) ছেষট্টি বৎসর বয়সে এই চরম-অতীন্দ্রিয় অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে ডাইওনিসিয়াস্ (Dionysious) ইহাকে ভাবাবস্থা অথবা ঈশ্বরের সহিত আত্মার মিলন বলিয়াছেন। চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত খৃষ্টান মরমী-দার্শনিক একহার্ট (Meiset Eckhart) সমাধিতে ভগবদনুভূতির অবস্থাকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "হৃদয়ে পূর্ণশান্তি বিরাজ করা চাই এবং কেবল তখনই ঈশ্বরের মৌনবাণী আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে এবং ঐশ্বরিক দিব্যজ্যোতিঃ মানুষকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহাকে ঈশ্বরে অর্থাৎ শিবে পরিণত করিতে পারে। যখন রিপুগণের উত্তেজনা প্রশমিত সমস্ত পার্থিব বাসনা শান্ত হয় এবং তখনই ঐশ্বরিক বাণী শ্রবণ করা যায়।"

প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক বাণী শুনিতে হইলে আমাদের চঞ্চল চিত্তকে সর্বতোভাবে শান্ত, সমাহিত ও একাগ্র করিতে হইবে। আমাদের মন যদি দুঃখ, বাসনা ও উদ্বেগের দ্বারা বিচলিত হইতে থাকে তাহা হইলে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা আমাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

যথাসময়ে ঐশ্বরিক বাণী শুনিবার জন্য আমাদিগকে ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে মনকে মুক্ত করিয়া শান্তি লাভ করিতে হইবে। এই শান্তিময় অবস্থায় ঈশ্বরের আদেশ লাভ করা যায় এবং ঐ আদেশ বা ভগবদ্‌প্রেরণার অর্থ হইল অন্তরে উচ্চতর চৈতন্যের অভিব্যক্তি লাভ করা। আমরা এই চৈতন্য প্রকাশের পর আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' (unknown and unknowable) বলে তাহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তখন উহা 'জ্ঞাত ও জ্ঞেয়' (known and knowable) হয়। কিন্তু সান্ত ও সসীম মনের দ্বারা সেই অসীম চৈতন্যস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। বরং মনকে অনন্ত ও বৃত্তিশূন্য করিতে হইবে এবং তবেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। অধ্যাত্মসাধনার দ্বারাই তাহা সম্ভব। যে ব্যক্তি এই দিব্যচেতনা লাভ করে নাই সে ইহার অর্থ উপলব্ধি করিতে শত শতবার জীবনে ভুল করিবে। সে হয়তো বলিবেঃ "সৃষ্ট জীবের পক্ষে স্রষ্টার সহিত অভিন্ন হওয়া কিরূপে সম্ভব?" অথবা বলিবেঃ "জন্ম হইতে যে মানব পাপী—সে কি কখনও এই অবস্থা লাভ করিতে পারে?" কেহ কেহ বলিবে উহা শূন্যতার অবস্থা। হোরেসিও ড্রেসার (Horatio Dresser), স্যাভেজ (Savage) এবং অপর কেহ কেহ ইহাকে সংজ্ঞাশূন্যতা বা চৈতন্যরহিত অবস্থা বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্যের কোনও অধ্যাপক একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, অতীন্দ্রিয় অবস্থা বলিয়া কিছু

নাই। যুক্তি বা বিচার বাক্যদ্বারা সকল বক্তির বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। নিজের মধ্যে এই অবস্থাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। সকল সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ স্বীকার করিয়াছেন এইরূপ একটি অবস্থা আছে। ইহা মূর্ছা, বায়ুরোগ বা সংজ্ঞাহীনতার ফলে কৃত্রিম নিদ্রাবস্থা (hypnotic sleep) নহে। এই তুরীয় অবস্থায় সমগ্র মানবপ্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। যিনি এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন তিনি আর পূর্বের ন্যায় জীবন যাপন করেন না; তিনি প্রজ্ঞা লাভ করেন, তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় ও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। হয়তো তিনি পূর্বে দ্বৈতবাদী ছিলেন ও বিশ্বাস করিতেন ঈশ্বর এই বিশ্বের বাহিরে অবস্থিত, কিন্তু জ্ঞান-লাভের পর তিনি সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইয়া নিখিল বিশ্বে এক সর্বব্যাপী ঐশী ইচ্ছাকে সর্বত্র ক্রিয়মান হইতে ও এবং নিজের অসীম ইচ্ছাকে আর বিশ্বব্যাপী অসীম ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র বোধ করেন না। যিনি এই বিরাট ইচ্ছায় ব্যক্তিগত ইচ্ছা সমর্পণ করিয়া বৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় শান্তভাবে অবস্থান করেন তিনিই আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করেন। বৃক্ষশাখা হইতে পতিত কোন পত্র যেমন একটি স্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চালিত হয় তেমনি প্রকৃত আধ্যাত্মভাবাপন্ন মানব স্বার্থসম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্পৃহাশূন্য হইয়া শান্তভাবে অবস্থান করিলে ঈশ্বরের অনন্ত ও বিরাট ইচ্ছা বায়ুর ন্যায় তাহার দেহ ও মনকে চালিত করে।

এইরূপ ব্যক্তির মন ও দেহ সর্বশক্তিময়ী ইচ্ছার যন্ত্র ও ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হয়। ইহাই আধ্যাত্মিক বিকাশের সপ্তম ও চরম-অবস্থা। হিন্দুদর্শনে ইহাকে জীবন্মুক্তি বলে। সাধক এই সময়ে খৃষ্টত্ব বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তবে এই দুইটি শব্দে আধ্যাত্মিক সত্যানুভূতির সর্বোচ্চ অবস্থা বুঝায়, কোন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায় না।

যদি কেহ বলেন, এইরূপ অবস্থা লাভ করা অসম্ভব, তাহা হইলে যীশুখ্রীষ্ট যে আপনার দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাঁহাকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র খৃষ্টধর্মরূপ সৌধ নির্মিত হইয়াছে এবং তিনি অতীন্দ্রিয় বা দিব্যজ্ঞান লাভের প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি এই অবস্থাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন ও এই শিক্ষাকে মরমীবাদ (mysticism) বলিতে পারেন। যদি ইহা দুর্জ্ঞেয় ভাবাবস্থা হয় তাহা হইলে যীশুখ্রীষ্টও একজন ভাববিদগ্ধ যোগী বা মরমী ছিলেন; তিনি তাঁহার দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং মরমীবাদের উপরই তাঁহার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর যীশুখৃষ্ট যদি সেই ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রত্যেকেই তাহা লাভ করতে পারেন। কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন যে, তিনি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম (exception) ছিলেন। কিন্তু বস্তুত আমরা প্রত্যেকে এই অবস্থা লাভ করিতে পারি; আমাদের কেহই নষ্ট হইবে না বা

অথবা অনন্ত নরকগামী হইবে না। এই ব্রহ্মদর্শন বা দিব্যজ্ঞান লাভেরও আবার বহু পথ আছে। যদি আমরা ঈশ্বরোপলব্ধিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে গ্রহণ করি, সত্যলাভের জন্য মনকে উন্মুক্ত রাখি ও অন্ধভাবে যে কোন শিক্ষার অনুসরণ না করিয়া সাধারণ জ্ঞান (common sense) ও যুক্তি প্রয়োগ করি তাহা হইলে সরলতা ও বিচারশক্তি পরিচালিত ঐকান্তিকতা ও প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সত্যের জন্য ব্যাকুল অনুসন্ধান নিশ্চয়ই আমাদিগকে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া ব্রহ্মানুভূতি ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার অবস্থায়ই লইয়া যাইবে। তাই যদি তুমি এই জীবনেই সেই অবস্থা লাভ করিতে চাও এবং ইন্দ্রিয়সুখের দাস না হইয়া নিজেই নিজের প্রভুরূপে আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে তোমাকে প্রথমে উন্নত ও দিব্য-প্রকৃতিদ্বারা পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। এই উচ্চতর প্রকৃতি পূর্ব হইতে তোমার মধ্যে নিহিত—ইহা উপলব্ধি কর। তোমার নীচপ্রবৃত্তি ও রিপুগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দমন কর, তাহা হইলে তুমি ইন্দ্রিয়সুখের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া আধ্যাত্মিক স্তরে স্বাধীনভাবে অধিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইবে। যদি এইরূপ জীবন যাপন করিতে না পার তবে যাঁহারা আত্মজয়ী হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গ কর। এই সাধুসঙ্গের ফলে তোমার জীবনে তাঁহাদের আদর্শ প্রতিফলিত হইবে।

এক্ষণে তুমি বলিতে পার যে, এইরূপ পুণ্যচরিত্র সাধু ব্যক্তি কোথা পাইব ? এইরূপ ব্যক্তির সন্ধান করা যদি তোমার পক্ষে অসম্ভব হয় তাহা হইলে যেকোন আদর্শ-জীবন গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ কর এবং সেইরূপ হইতে চেষ্টা কর। যদি যীশুখৃষ্টের[১] উপর তোমার বিশ্বাস থাকে তবে সেই আদর্শকেই নিজের মনের সম্মুখে সর্বদা রাখিবে এবং তাঁহার জীবনকে আদর্শ করিয়া তদনুসারে স্বীয় জীবন গঠিত করিতে চেষ্টা করিবে। আদর্শসম্বন্ধে অন্য কাহারও ব্যাখ্যা বা অভিমত শ্রবণ করিবে না। সর্ববিধ দেববাদ, কুসংস্কার ও পুরোহিতকুলের মনগড়া যুক্তিকৌশল দূরে সরাইয়া দিয়া যীশুখৃষ্টের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিতে যত্নবান হইবে এবং তাহা হইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান আপনার অন্তর হইতে আসিবে। যদি এইরূপ করিতে না পার এবং ঈশ্বর ও প্রার্থনায় বিশ্বাস থাকে তবে ঈশ্বরের উপাসনা কর এবং তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে! যদি ভগবানের নিকট প্রার্থনায় তোমার বিশ্বাস না থাকে ও যীশুর জীবন অনুসরণ করিতেও প্রবৃত্তি না হয় তাহা হইলে তোমার পথ পুনরায় ভিন্ন হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও হতাশ হইবে না, কারণ অন্য পথ বা উপায়ও আছে। ঈশ্বরকে বিশ্বাস বা যীশুকেই তোমার কেবল পূজা করিতে হইবে

১। আমেরিকায় খৃষ্টান শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে এই বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া এখানে বিশেষভাবে যীশুখৃষ্টের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

না। যথার্থ সত্যের অন্বেষণ করা পরিণামশীল হইতে অপরিণামীর সত্তার এবং ভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পার্থক্য বিচার কর। এই বিবেক বা বিচারশক্তি পূর্ব হইতে তোমার মধ্যেই নিহিত। সত্যজ্ঞানের জন্য তোমার 'ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে না। তোমার মনশ্চক্ষু উন্মীলিত কর। চৈতন্য কি, জড়পদার্থ কি, জড় হইতে চৈতন্যের উদ্ভব সম্ভব কিনা এবং এই জীবন আকস্মিক বা কার্য-কারণ-নিয়মসম্ভূত কিনা তাহা বিচার ও অনুভব কর। এইভাবে বিচার করিতে অসমর্থ হইলে তুমি কে ও বিশ্বের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ তাহাই জানিতে চেষ্টা কর। ইহাও সহজসাধ্য বলিয়া মনে না হইলে নিঃস্বার্থ কর্ম অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল কর্মের জন্য কর্ম কর। তোমার দৈনন্দিন জীবনে যখন কোন কর্ম আসিবে তখনই ভাবিবে—যেন তোমার ঋণ পরিশোধ করিতেছে, কোন-কিছু লাভের জন্য কর্ম করিতেছ না। আপনার কর্তব্য যথাসম্ভব সম্পন্ন করিবার চেষ্টা কর এবং ফলের জন্য আদৌ চিন্তিত হইবে না। ইহাও যদি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তবে সকল জীবকে আত্মবৎ ভালবাসিতে চেষ্টা কর। যদি আবার মনে কর যে, তাহাতেও সহজে কৃতকার্য হইবে না তাহা হইলে তোমার উচ্চতর প্রকৃতিতে মন একাগ্র করিয়া পবিত্র কোন মন্ত্র অথবা কোন পবিত্র ভাব লইয়া ধ্যান কর।

ব্রহ্মদর্শন ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতালাভের শত শত উপায়

আছে। সত্যান্বেষীর সংখ্যা যত, সত্যলাভের পথও তত। বেদান্ত-দর্শনের শিক্ষার ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহা কেবল মাত্র উপায় নির্দেশ করিয়া অন্যগুলিকে নিন্দা করে না। বেদান্ত বলে, প্রতিটি পথ জীবাত্মার শক্তি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী হওয়া উচিত। একজনের পক্ষে যে পথ হিতকর, অন্যের পক্ষে তাহা সেইরূপ নাও হইতে পারে। তাহার পর আমরা যে স্তরে বাস করি, উন্নতির জন্য ঠিক সেই স্তর হইতে আমাদিগকে পুনরায় সাধনা আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা প্রতিটি ক্রমবিকাশের এক একটি স্তরে বা সোপানে অবস্থিত। সুতরাং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বভাবের উপযোগী পন্থা অবলম্বন করিয়া অকপটভাবে তাহার অনুসরণ করা উচিত এবং অপরের মতামতে মনকে বিচলিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। আমাদিগকে আপন বিচারশক্তি ও সাধারণ জ্ঞান (common sense), অর্থাৎ যাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞান তাহারই প্রথমে অনুশীলন করিতে হইবে। এইরূপ ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে আমাদের হৃদয়াকাশে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সূর্য উদিত হইবে ও তখনই আমরা সকল বস্তুর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইব। পক্ষান্তরে অপরের মতানুসারে চলিলে আমাদের বিশেষ-কিছুই লাভ হইবে না। বিশ্বে সহস্র সহস্র প্রচারক, দার্শনিক ধর্মযাজক ও পুরোহিত আছেন যাঁহারা সকলেই নিজ নিজ সাধনার পথকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সত্যপথ বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এখন কোন্‌টি যে ঠিক পথ তাহা কে স্থির করিবে? যে পর্যন্ত না আমাদের জ্ঞানের সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ হয়, সেই পর্যন্ত কোন্‌টি যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা চরমপথ তাহাও আমরা নির্ধারণ করিতে পারি না। কারণ আমাদের সিদ্ধান্ত কতকগুলি অবস্থা বা আদর্শের (standard) উপর নির্ভর করে। তাহারাও আবার পরিবর্তনশীল। আজ যাহাকে সর্বোচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছে, কাল হয়তো তাহাকে সেইরূপ বোধ নাও হইতে পারে। যিনি মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইয়াছেন তিনিই কেবল বলিতে পারেন যে, কোনটি প্রকৃতপক্ষে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। আদর্শ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে পৃথক পৃথক—এইকথা বিশ্বের মহাজ্ঞানী ও বরেণ্য ধর্মগুরুগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দিব্যজ্ঞানের অবস্থা সর্বত্রই একরূপ এবং এই অবস্থা বর্ণনায় তাঁহারা সকলেই একমত। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং এমন কি চিন্তাশীল মরমিগণ প্লাটিনাস্‌ ও একহার্ট প্রভৃতি সকলের উক্তিতে এই সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল সত্যান্বেষীর পক্ষে সার্বভৌম সত্য এক এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা দিব্যজ্ঞান লাভই সকলের চরমলক্ষ্য।

দিব্যজ্ঞান লাভ সমস্ত ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। আমরা যে কোন মতভুক্ত বা সম্প্রদায়ভুক্ত হই না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আধ্যাত্মিকতা কোন মতবাদে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ কিংবা কোন সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে

না। ইহা মানবের আভ্যন্তরিক দিব্যপ্রকৃতির পরিপূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে। যে ধর্ম ইহা শিক্ষা দেয় না এবং যাহা বলে না যে, ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরের উপলব্ধিতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার। সেই ধর্ম ধর্ম নামের যোগ্য নহে, সেইরূপ ধর্ম কৃত্রিম, সুতরাং নিষ্প্রয়োজন। অনেকে বেদান্তকে শুষ্কবিচার ও তর্কপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র বলিয়া মনে করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেকথা সত্য নহে। প্রতিটি জীবাত্মাকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ এবং প্রত্যেক আত্মাকে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎকার করানোই বেদান্তের আদর্শ। বেদান্তমতে প্রতিটি জীব বা আত্মাই আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের প্রণালী অনুসারে শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক কোন-না-কোন কালে ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা লাভ করিবে। শত শত জন্ম পাপকার্য করিয়া আসিতেছে এইরূপ মহাপাপীও যদি মুহূর্তের জন্য তাহার দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে সে সর্বপাপমুক্ত হইয়া এই জীবনেই পবিত্র, পূর্ণ ও ঐশ্বরিক ভাবসম্পন্ন হইবে। যে কেহ সমাধি, আত্মসাক্ষাৎকার বা দিব্যজ্ঞানের অবস্থা লাভ করে সে ব্যক্তিই ব্রহ্মের সহিত নিজস্বরূপের একাত্মতা ও অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হয়!

॥ উপসংহার ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা, অনাত্মা ও আত্মা, জড় ও চৈতন্য, ভূমি ও ভূমা, জীব ও ঈশ্বর, অবিদ্যা ও বিদ্যা, অন্ধকার ও আলোক—এই দুইটি সত্তা ও পদার্থকে লইয়াই প্রতিটি শাস্ত্রের ও সাধনার প্রচেষ্টা, প্রতিটি মানবের জীবনকর্মের আকুলতা ও জীবনের জিজ্ঞাসা। দুই আছে বলিয়াই আমরা একে বা অদ্বিতীয় বস্তুতে উপনীত হইতে চেষ্টা করি। কিন্তু আত্মার বিকাশ বলিতে আমরা বুঝি কি ? আমরা বুঝি জীব বা মানুষের যথার্থ স্বরূপের বিকাশ, নচেৎ আত্মা অখণ্ড, এক ও অদ্বিতীয়। আত্মার গতি অপূর্ণ হইতে পূর্ণতা বা পরিপূর্ণতার দিকে। তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপাপ-বিদ্ধ, সুতরাং অপূর্ণতা হইতে তাঁহার মুক্তি বা পূর্ণপ্রকাশের কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না। অবিদ্যামোহিত জীব বা সাধারণ মানবাত্মার যথার্থসত্তার বিকাশরূপ পরি-পূর্ণতার নামই 'আত্মবিকাশ'। অন্য কথায়, মানুষ বা সকল প্রাণীর যথার্থ স্বরূপসত্তার বিকাশ ও তাহার অনুভূতিই 'আত্মবিকাশ'-শব্দের সার্থকতা।

মায়াসমাচ্ছন্ন জীবের বা মানুষের অসম্পূর্ণ সত্তার পূর্ণ-প্রকাশকে সার্থক করার জন্যই আত্মসংযম, আত্মসংযমের পর ধারণা ও ধ্যান, অর্থাৎ বিভিন্ন দিকে বিচ্ছুরিত মনের একীকরণ

না সমীকরণ এবং পরে ঈশ্বরচৈতন্যরূপ আত্মার বা ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অনুভূতি। এইরূপ আত্মস্বরূপের পূর্ণানুভূতির নাম 'গড্‌ কন্‌সাসনেস্‌' বা ঈশ্বরানুভূতি।

আত্মসংযম বা আত্মদমন এই কারণে প্রয়োজন যে, সাধারণ আত্মা বা জীবাত্মারূপ মানুষের মন চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ-রস-গন্ধপূর্ণ পৃথিবীর সকল বস্তুতে আসক্ত থাকে। এই আসক্তি-নিরাসক্তিরূপ যথার্থস্বরূপের সন্ধান দিতে পারে না। ঈশ্বরবিমুখ ভোগাসক্ত মন সর্বদাই চঞ্চল। এইরূপ মন বাহ্যবস্তুর সৌন্দর্যেই সর্বদা মোহিত থাকে, অন্তরে বা সকলের হৃদয়ে আসীন পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয় না। সেইজন্য 'কঠোপনিষেদে' বলা হইয়াছে--"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্‌"। 'খানি' কিনা ইন্দ্রিয়ানি। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বিশ্বের বাহ্য-সৌন্দর্যেই আসক্ত হইয়া থাকে, অন্তর্যামীরূপে অন্তরে সে সর্ববন্ধনমুক্ত আত্মা সমাসীন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আত্মসংযমরূপ সাধনা বা কর্ম বহির্বস্তুর দিকে চালিত ও বিক্ষিপ্ত মনকে একটি বস্তুতে কেন্দ্রীভূত করে এবং সেই কেন্দ্রগত স্থির ও অচঞ্চল মন আত্মস্বরূপের নিরাবরণরূপে নিবদ্ধ হইবার চেষ্টা করে। ঋষি পতঞ্জলি যোগসাধনার প্রবর্তন করিয়া এই সচঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ বা সমাহিত করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ"। 'যোগ' অর্থে মনকে সমাহিত বা বিশুদ্ধচৈতন্যে

কেন্দ্রায়িত করা। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল মনই সংসার ও বন্ধন এবং অচঞ্চল মন বিশুদ্ধচৈতন্য। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণে মনকেই জগৎ-এর কর্তা বা স্রষ্টা বলা হইয়াছে। মন সংযত হইলে বা সচঞ্চল মন স্থির-ধীর-অচঞ্চল হইলে মানুষ নিজের পরিশুদ্ধ স্বরূপকে অনুভব করিতে পারে। মনের চাঞ্চল্যরূপ বৃত্তিকে স্থির করিবার জন্যই ধারণা ও ধ্যানের প্রয়োজন। 'ধারণা' -শব্দের অর্থ মানুষ যে অজ্ঞানাবদ্ধ প্রাণী নহে, জন্ম-মৃত্যুরূপ আবর্তনের অধীন নহে—ইহা বারবার চিন্তা বা মনন করা। এইরূপ বারংবার চিন্তা বা মনন যখন ঘণীভূত হয় তখনই হয় ধ্যান। 'ধ্যান' কিনা আত্মাচৈতন্যরূপ বিশুদ্ধস্বরূপে মনকে সম্পূর্ণভাবে স্থির করা। বায়ুবিহীন নিস্তরঙ্গ স্থানে প্রদীপের শিখা যেইরূপ সর্বদা অচঞ্চল, স্থির, ধীর থাকে সেইরূপ মনে বাসনা-কামনারূপ বৃত্তি বা তরঙ্গ না থাকিলে মন আত্মস্বরূপে স্থির ও স্থিত হয়। মনের এই অচঞ্চলরূপের স্থিতির নামই 'ধ্যান'। ধ্যানে মন একাগ্র হয়, চৈতন্যরূপ আত্মায় স্থিত হয় এবং আত্মস্বরূপের জ্ঞানে মহিমান্বিত হয়। গীতা ও অন্যান্য অধ্যাত্মশাস্ত্রে এই ধ্যানের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ঋষি পতঞ্জলি বিশেষভাবে ধ্যানের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

ধ্যানের স্থিতাবস্থার নাম 'সমাধি'। 'সমাধি' বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু নির্বিকল্প বা সকল কল্পনা ও বৃত্তিবিহীন অবস্থাই সমাধির চরমরূপ। এই নির্বিকল্প অবস্থায় 'আমি'-র সংস্কারও থাকে না, থাকে একমাত্র আত্মানুভূতি বা ব্রহ্মানুভূতি।

ব্রহ্মানুভূতির অপর নাম ঈশ্বরচেতনা, ঈশ্বরানুভূতি বা 'গড্‌কনসাসনেস্‌'। ঈশ্বর বলিতে সগুণ ঈশ্বর নহেন— যিনি মায়ার (মহামায়ার) সাহায্যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কার্য করেন, এই ঈশ্বর বিশুদ্ধচৈতন্য—যাহাকে বেদান্তদর্শন 'তূরীয়' বা 'চতুর্থ চৈতন্য' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই ঈশ্বরে অবিদ্যা বা মায়া নাই, এমন কি মায়ার কল্পনাও নাই, কারণ মায়াই বন্ধনের সীমরেখা সৃষ্টি করে। মন সমাহিত হইলে নির্বিকল্পসমাধি ও তাহাতে স্থিত হইলে বিশুদ্ধচৈতন্যরূপ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হয়। 'অপরোক্ষ' অর্থে সাক্ষাৎ, অর্থাৎ অপরোক্ষ-অনুভূতিতে মানুষের যথার্থস্বরূপ যে আত্মা বা ব্রহ্ম ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রতীতি বা জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের নাম 'ব্রহ্মবিজ্ঞান'। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান-রূপ স্বরূপজ্ঞানের অনুভব হইলে সকল হৃদয়গ্রন্থীর নিরসন হয়, সকল সংশয় দূরীভূত হয় ও সকল প্রকার সকাম কর্মের তথা বাসনা-কামনার নিবৃত্তি হয় এবং তখনই ঈশ্বরদর্শন হয়। ঈশ্বরদর্শন ও আত্মানুভূতি এককথা। এই অনুভূতিলাভই সকল মানুষের জীবনের চরমলক্ষ্য।